প্র থ ম অ ধ্যা য়

বিনির্মাণবাদ এবং মনসামঙ্গল কাব্যের নানা রূপ

মনসামঙ্গল কাব্যধারা মধ্যযুগের কাব্যধারাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রচারপ্রাপ্ত ও জনপ্রিয়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতো নিষ্ঠ সমালোচক 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যকে বঙ্গের রামায়ন বলেছেন। স্থান বিশেষে মনসামঙ্গলকাব্য নানা কবির হাতে বারবার নবরূপ পেয়েছে। অনুলিখিত হয়েছে অসংখ্য লিপিকরের হাতে। আবার সেগুলি পালাকারদের হাতে এত বিপুল হারে পরিবর্তিত হয়েছে যে, মূল পাঠটিই হারিয়ে গেছে বেমালুম। এক কবির নামের সঙ্গে ভণিতায় যুক্ত হয়ে গেছে এক বা একাধিক অন্যান্য কবির নাম। কখনো বা কোনো জনপ্রিয় কবির নামের আড়ালে কোনো কবিযশপ্রার্থী পালাকার বা অপরিচিত কবি কাব্য রচনা করে গেছেন। কোথাও আবার পরবর্তী গবেষকরা মহা সমস্যায় পড়েছেন এক কবির নামে একাধিক পুথি আবিষ্কার করে। উদ্ধার করাই সমস্যার হয়েছে কোন পুথির কতখানি কোন কবির রচনা। একই কাহিনির অল্প-বিস্তর পরিবর্তন একই নামের কবির নানা পুথিতে দেখা গেছে। আবার কোথাও কোথাও পরিবর্তন এত বিপুল যে, স্পষ্ট বোঝা যায় কবিরা শুধু নামে ও শৈলীগত আত্মপ্রকাশেই ভিন্ন নন, ভৌগোলিক আবস্থানেও ভিন্ন। ভিন্নতা কাহিনির অন্তর্গত চরিত্র-ঘটনাধারা-সমাপ্তির দিক থেকে, আবার নামের দিক থেকেও। উত্তরবঙ্গ, রাঢ়বঙ্গ, পূর্ববঙ্গের মনসা কাহিনির মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য নিষ্ঠ পাঠকের চোখে পড়তে বাধ্য। আমরা বর্তমান অধ্যায়ে মনসামঙ্গল কাব্যের যতদূর সম্ভব প্রাপ্ত কাব্যগুলিকে নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করব। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যে বিনির্মাণবাদের প্রেক্ষিত খুঁজতে একটা গবেষণাকর্মের ধারাপাত ঘটানোর পূর্বে বিনির্মাণবাদের তত্ত্বগত দিকটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেটা সম্যক আলোচিত না হলে আলোচনার মানদণ্ডটিই নির্মিত হয় না। উত্তরআধুনিক তত্ত্ববিশ্বের একটি বহুল আলোচিত দৃষ্টিকোণ হল বিনির্মাণ বা ডিকন্সট্রাকশন। প্রথমেই এই বিষয়টা আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকা জরুরি যে, বিনির্মাণ কোনো তত্ত্বের নাম হয়ে উঠুক, সেটা এই

মতধারার অনুপন্থীরাই চাননি। চেয়েছেন বিনির্মাণকে দেখা হোক একটা দৃষ্টিকোণ হিসেবে, পাঠের একটা রীতি হিসেবে। একটা 'approach' বা একটা 'way of reading a text'।

প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা বিনির্মাণের তাত্ত্বিক মীমাংসা খুঁজে নিতে চেষ্টা করব। আমরা মীমাংসা বলছি একারণেই যে, এই বিনির্মাণ নিয়ে যথেষ্ঠ ধোঁয়াশা সমালোচক ও তাত্ত্বিক মহলে রয়েছে। অনেকেই এমন মনে করে থাকেন, বিনির্মাণ আসলে সোনার পাথরবাটির মতো একটা অসম্ভব কল্পনা। পাঠের ক্ষেত্রে বাস্তবে এই পদ্ধতি লাগু হতেই পারে না। আসলে নির্বিবাদী স্থিতিকামী সমালোচনায় এই অভিব্যাক্তিই স্বাভাবিক। মানুষ শান্তি চায়। দাঁড়াবার জায়গা চায়। চলতে চায় চেনা গলিপথ ধরে। সাহিত্য পাঠ করতে এসে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আকাঙ্ক্ষিত নয় সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে। তাই অনুধাবন না করে শুরুতেই যদি নাকচ করে দেওয়া যায়, তবে অশান্তির অভিঘাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা যায় অনেক ক্ষেত্রে। ব্যথা নেই মনে করাটাও ব্যথার উপশমের একটা স্বীকৃত উপায়। সমালোচনা তথা পঠনবিশ্বও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বিনির্মাণবাদ অর্থের উপলব্ধির পরমুহূর্তেই তাকে নস্যাৎ করতে অগ্রসর হয়। সেক্ষেত্রে যাঁরা পাঠ ব্যাখ্যা করে সাহিত্য সমালোচক মহলে স্থায়ী নাম কিনতে চান, তাঁদের এই পদ্ধতি পছন্দ না হওয়ারই কথা। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যাও নিষ্পন্নের পরমুহূর্তেই প্রশ্ন-সংশয়িত হয়ে পড়বে। অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। তাই ওই পদ্ধতিতে পাঠ হয় না বলার একটা প্রচেষ্টা আছে পাঠক-সমালোচক মহলে। আমরা তাই সংশয়ের মীমাংসা করে নিতে চাই। দেখতে চাই বিনির্মাণবাদী পাঠ-প্রক্রিয়া আসলে কোন পথ পরিগ্রহের কথা বলে।

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

সমকালীন চিন্তাবিশ্ব ও ইতিহাস প্রবাহ : জাক দেরিদা ও বিনির্মাণবাদ

বিনির্মাণবাদ নিয়ে আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে এর সমসাময়িক ইতিহাসের ক্রমিক প্রগতিটি পর্যালোচনা করে নেওয়ার দরকার আছে। আর এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম মহাযুদ্ধের সমকাল থেকেই সতর্ক ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন।

প্রথম মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ, যাই বলি না কেন, ঘটনাটি ছিল অপ্রত্যাশিত ভাবে অভূতপূর্ব। এই যুদ্ধের হোতা যাঁরা ছিলেন, সম্ভবত তাঁরাও এর ফলাফল সম্বন্ধে অন্ধকারে ছিলেন। তাঁরা এই বিশ্বব্যাপ্ত ফলপ্রসারী যুদ্ধটি শুরু করেছিলেন তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক-কুটনৈতিক-অর্থনৈতিক লাভের প্রত্যাশা থেকে। ২৮ জুলাই ১৯১৪ থেকে শুরু হয়ে যুদ্ধ চলেছিল ১১ নভেম্বর ১৯১৮ পর্যন্ত। নব্বই লক্ষ সৈন্য এবং সত্তর লক্ষ সাধারণ মানুষের মৃত্যুর প্রহর গুনে শেষ হল এই নরমেধ যজ্ঞের।[১] অষ্ট্রিয়ার আর্কডিউকের হত্যাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের সূচনা হলেও, যুদ্ধে লিপ্ত প্রত্যেকটি বৃহৎ শক্তির কিছু না কিছু আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার ছিল। সমস্ত শক্তি একই সঙ্গে যুদ্ধের আকাশে নিশানও ওড়ায়নি। যুদ্ধ চলাকালে নানা শক্তির নানা ভাবে আগমন-নির্গমন ঘটেছে। যুদ্ধে আমেরিকার প্রবেশ যেখানে অস্ত্রের বাজার ধরতে, সেখানে জাপানের প্রবেশ ভূমধ্যসাগর ও চিনের ওপর কব্জা কায়েম করতে। একটা অসমাপ্ত বৈরিতা দিয়ে দলাপাকানো রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় যুদ্ধ শেষ হয়েছিল বলেই মাত্র বিশ বছরের ব্যবধানে আরও একটা বিশ্বযুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আরও মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তার ফলাফল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল, যুদ্ধে লিপ্ত কোন পক্ষের কতখানি সহায়ক হয়েছিল, তার কথা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান গবেষণায় সে বিষয়টি আলোচনার অবকাশ নেই। আমরা কেবল লক্ষ্য করতে চাই যুদ্ধের সেই প্রভাবটি, যা বিশ্বমননে প্রভাব ফেলেছিল।

খুব সহজ করে বললে বলতে হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্বের দরবারে বিশ্বযুদ্ধের কোনো ধারণা ছিল না। বরং সে তাবৎ কালের যুদ্ধের যা ইতিহাস, তার ভিত্তিতে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা শিভ্যালরি কাজ করছিল মানুষের মনে, মননে। নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ যুদ্ধের ধারণা দুমড়ে মুচড়ে দিল বিশ্বযুদ্ধ। সর্বজনীন ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেল না জয়ী, পরাজিত, নিরপেক্ষ---কোনো পক্ষই। মৃত্যু, শারীরিক অক্ষমতা, পঙ্গুত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, নিরন্নতা, উদ্বাস্তু---এই সব অন্ধকারকেও ফিকে করে দিল স্থায়ীত্ব, প্রেম, প্রণয়, মানবিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাসভঙ্গের কৃষ্ণগহ্বর। আগামীর প্রতি মানুষের বিশ্বাসটাই হারিয়ে গেল। মারণাস্ত্রের অপ্রত্যাশিত আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত মানুষ বিশ্বাস করাটাকেই সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। প্রাজ্ঞ মননে বার বার এই অনুভব জন্ম নিতে লাগল যে, পুরাতন যা কিছু ছিল পৃথিবীতে, তার বিনাশ সাধিত হয়ে গেছে। মানুষের কাছে আর আগামী বলে কোনো স্বস্তি-সান্ত্বনার জায়গা থাকছে না। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কোনো প্রত্যাশিত স্থিরতা নেই। বিশ্বাসটাই সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করল। ততদিনে মানুষের মনে প্রত্যয় জন্মেছে ঈশ্বর

মৃত, মনুষ্যত্ব মৃত, শুভবুদ্ধি মৃত। মানুষের তৈরি রাষ্ট্রই ফ্রাঙ্কেস্টাইনের মতো 'মানব'-কে গ্রাস করতে উদ্যত। তারই প্রভাবে তত্ত্ববিশ্বেও দেখা দিল একটা নজরে পড়ার মতো পরিবর্তন। রাজনৈতিক ধারণার যে অস্বচ্ছতা এবং অন্ধ জাতীয়তাবাদের যে মায়াজাল বিস্তার করে যুদ্ধবাজ দেশনেতারা এই মহাযুদ্ধকে সম্ভবপর করে তুলেছিলেন, তার বিপক্ষ কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে প্রকট হতে শুরু করল। সৃজনের গঠনেও চলে আসা পৌনঃপুনিকতায় ছেদ দৃষ্টিগোচর হল। পাঠের বিষয়বস্তুর প্রাধান্য প্রশ্নের মুখে পড়ল। বিষয়ীর ঈশ্বরপ্রমাণ আসন আক্রান্ত হতে লাগল। বদলে যেতে লাগল পাঠের গঠন এবং পাঠতাত্ত্বিক সমালোচনার পরিমণ্ডল।

জাক দেরিদার জন্ম ও সমকাল সম্বন্ধে আভাস আমরা পূর্বেই দিয়েছি। কিন্তু তাঁর চিন্তা-চেতনার বিকাশের স্বরূপটি ঠিকঠাক বুঝতে সমকালের মহারথীদের সৃজন ও দেরিদার জীবনের ঘটনাবলীর প্রতিও সমান অধ্যয়ন দরকার। সেটা না হলে আন্তর্সম্পর্কযুক্ত তাঁর তত্ত্বচিন্তার ভিত্তিভূমিটা আমরা ধরতে পারব না। প্রথমেই আমরা দেখে নেব কী কী কালজয়ী সৃজনের সমকালে দেরিদার চিন্তা-ভাবনাগুলো লালিত হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে জাঁ পল সার্ত্রের (১৯০৫-৮০) 'Situations'[২] প্রবন্ধ সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির এমন মননঋদ্ধ লেখা নিঃসন্দেহে সার্ত্রের নিষ্ঠ পাঠক দেরিদার মধ্যে আবেদন রেখেছিল চিন্তাকে গভীরতর করে তোলার। সাহিত্য ও সমাজকে লগ্ন করে সার্ত্রের এই প্রবন্ধগুলি অস্তিত্ববাদী চিন্তার সারাৎসার প্রকট করেছিল দেরিদার কাছে। ওই একই বছরে প্রকাশিত হয় আলব্যের ক্যামুর উপন্যাস 'The Plague'।[৩] বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সময়কালের কোনো মিল নেই। ক্যামু বর্ণিত সময়ে ফ্রান্স-আলজেরিয়ার ওরান শহরে ঐতিহাসিক ভাবে কলেরা বা প্লেগের মতো কোনো মহামারীর আক্রমণ ঘটেনি। আসলে নাৎসি আক্রান্ত ফরাসি জনতার দুর্বিষহ অবস্থাই উপন্যাসে বর্ণিত রূপকের প্রেরণা। অনেকেই ফ্রানৎস কাফকার 'The Trial' উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব এই উপন্যাসে দেখেছেন। সেটি বিবেচনা করার জায়গা বর্তমান গবেষণায় না থাকলেও একথা বলাই যায় যে, ক্যামুর অ্যাবসার্ডিটির দর্শন এ উপন্যাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। ফরাসি-আলজেরিয়ান হিসেবে এই উপন্যাস দেরিদাকে ভাবিয়েছিল সন্দেহ নেই। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ আর ক্যাম্যুর অ্যাবসার্ডিটি দেরিদার চিন্তায় প্রভাব ফেলেছিল।

১৯৪৮ সালে বেতারে গ্রাঁদ একোলে প্রস্তুতি-পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপকের ভাষণ জাক দেরিদার চেতনায় গভীর প্রভাব যে ফেলেছিল, সেকথা প্রস্তাবনা অংশেই আমরা উল্লেখ করেছি।[৪] এখানেও সেই ক্যামুর প্রভাবের কথা চলে আসে। স্পষ্টতই

বলা যেতে পারে ক্যামুর দর্শন দেরিদাকে প্রবল আলোড়িত করেছিল। ১৯৫০ সালে ক্যামুর প্রথম প্রবন্ধ সংগ্রহ 'Aktuelles' প্রকাশিত হয়। উজ্জ্বল ছাত্র হিসেবে বছর কুড়ির দেরিদা তখন ফ্রান্সে দর্শনের অধ্যয়নে নিয়োজিত। হেগেল-গবেষক জাঁ ইপ্পোলিতের সঙ্গে একোলে নর্মাল সুপেরিয়রে হুসের্লের দর্শনচিন্তা নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করছেন। পাশাপাশি সার্ত্রের ও ক্যামুর দুই বিপরীতমুখী ভাবনা চিন্তার টানাপোড়েন তাঁর ভাবনার গতিধারাকে আলাদা মাত্রা দান করছে। ১৯৫১ সাল থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সার্ত্রে ও ক্যামু প্রকাশ্যেই বৌদ্ধিক বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছেন। সমাজ সচেতনতার গ্রহণযোগ্য দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করলেও দৃষ্টিকোণগত পার্থক্য উভয়ের মধ্যে একটা আড়াআড়ি বিভাজন রেখা প্রকট হয়ে উঠছে। এই বছরেই প্রকাশ পাচ্ছে ক্যামুর আরও একটি উল্লেখযোগ্য বই 'The Rebel'। প্রতিষ্ঠানকে ভাঙচুর করে নানা মাত্রিক প্রত্যয়ের সন্ধান করার স্বাধীন বাসনা দেরিদার মনে এই সমসাময়িক ব্যাপারগুলিই নির্মাণ করেছিল সন্দেহ নেই।

শুধু সার্ত্রে বা ক্যামু নন, এই সময় গভীর ভাবনার ছাপ রাখছেন রোঁলা বার্ত (১৯১৫-৮০), জাক লাঁকা (১৯০১-৮১), জাঁ ইপ্পোলিত , ক্লদ লেভিস্ট্রস (১৯০৮-২০০৯) প্রমুখ পাশ্চাত্য দর্শনের মহাপণ্ডিতবর্গ। ১৯৫৩ সালে যেমন ক্যামুর প্রবন্ধ সংগ্রহের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনি প্রকাশ পাচ্ছে রোঁলা বার্তের 'Writing Degree Zero', প্রকাশ পাচ্ছে জাক লাঁকার 'The function and field of speech and language in psychoanalysis'। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হচ্ছে জাঁ ইপ্পোলিতের 'Studies on Marx and Hegel' এবং ক্লদ লেভিস্ট্রসের 'Tristesn Tropiques'। ফ্রান্সে তখন শুরু হয়েছে মার্ক্সবাদকে নিয়ে নতুন অনুসন্ধান। প্রাক্তন মার্ক্সবাদী দার্শনিকরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে চলেছেন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করতে করতে বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলে মার্ক্সবাদের চর্চাকারীরা নিজেরাই একটা অনড় রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রের জন্ম দিয়েছেন কিনা। বিরুদ্ধস্বরকে প্রতিক্রিয়াশীলতার চাদরে ঢাকতে গিয়ে একটা নির্বিকল্প প্রতিষ্ঠানের দালালি করছেন কিনা। মার্ক্সবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কতটা সম্ভবপর সেটা নতুন করে ভাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন ফরাসি ভাবুকরা। একই সঙ্গে তাঁরা পক্ষপাতশূন্য সাহিত্য বিশ্লেষণ ও সমাজবীক্ষাকে বলবতী করে তুলতে ভাষার এবং কথনবিশ্বের নানামাত্রিক পর্যালোচনাকে উৎসাহিত করছেন নিজেদের লেখালিখিতে।

এই সময় থেকেই বিনির্মাণবাদের প্রাথমিক ভাবনাগুলো জারিত করছে জাক দেরিদার মনন চিন্তনকে। সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি এই সময়ের ভাবনার ফসল,

যদিও ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত বই 'Speech and Phenomena' থেকে। ফ্রান্স তথা ইউরোপের দর্শন চিন্তার আবহটা তখন দ্রুত বদলাচ্ছিল। নতুন নতুন সমস্যা, নতুন নতুন প্রশ্ন-পরিপ্রশ্ন, নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ সামনে আসছিল অহরহ। ১৯৫৭ সালে প্রকাশ পেল ক্লদ লেভিস্ট্রসের বিখ্যাত বই 'Mythologies' এবং ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় 'Structural Anthropology'।[৫] ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুর যে চিহ্ন-চিহ্নায়ক-চিহ্নিত ডায়াগ্রামে ভরসা রেখেছিলেন, সেই ডায়াগ্রাম থেকে অনেকখানি সরে এসে সংস্কৃতির অস্থি-মজ্জার সঙ্গে সম্পর্কিত করলেন চিহ্নতত্ত্বকে লেভিস্ট্রস।

এই বিষয়টি দেরিদাকে প্রবল ভাবিয়েছিল। পরবর্তী কালে নিজের গ্রামাতোলজির ব্যাখ্যায় স্যোসুর ও লেভিস্ট্রস থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখলেন দেরিদা। বিষয়টি সবিস্তারে পরবর্তী ধাপে আলোচিত হয়েছে। এই সময় ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণও প্রশ্নের মুখে পড়ল। সামূহিক নির্জ্ঞানের ভাবনাকে নতুন মাত্রায় আলোচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত 'The Agency of the Letter in the Unconscious or Reason Since Freud' বইতে। পাঠের অর্থগত প্রশাসনের বিপরীত প্রান্তে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেরিদার ভাববিশ্বে এই গ্রন্থগুলো প্রভূত প্রভাব ফেলেছিল। এরই মধ্যে আর একজন ফরাসি ভাবুকের সৃজন ১৯৬১ সালে দেরিদার হাতে চলে আসে। সেটি হল মিশেল ফুকোর (১৯২৬-৮৪) 'Madness and Civilization'।[৬] মিশেল ফুকোও প্রাথমিক পর্যায়ে কম্যুনিস্ট ছিলেন। কিন্তু স্টালিনের (১৮৭৮-১৯৫৩) নানা কাজ-কর্ম তাঁর মধ্যে কম্যুনিজম সম্বন্ধে কিছুটা মোহভঙ্গ করে। ফ্রান্সে তখন স্টালিনবাদ থেকে সরে আসা এক নিওকম্যুনিজমের চর্চা চলছে। ফুকো সেখানেও আগ্রহ দেখাননি। কারণটা আমরা আগেই বলেছি। ফ্রান্সে তখন পূর্বতন কম্যুনিস্টদের বেশির ভাগের পর্যবেক্ষন একই রকম ছিল। তাঁদের উপলব্ধি মার্ক্সবাদে যে রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখানো হয়ে এসেছে, তা আসলে এক কল্পরাজ্যের পিছনে কিছু মানুষকে ধাবিত করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা সফল হওয়ার নয়। কম্যুনিস্টদের কয়েকটি স্থানে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে উত্থানের ও পতনের পরবর্তী ইতিহাস ঘেঁটে, কিছু কম্যুনিস্ট দেশের পার্টিনীতি বদল করে পুঁজিবাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করা দেখে এবং কিছু দেশ ও প্রদেশের কল্পিত আগামী কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের স্বপ্ন-দর্শন উপলব্ধি করে আমাদেরও সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ঠিক কোন অবস্থা থেকে ফুকোরা কম্যুনিস্টদের প্রতি আস্থা হারালেন।

এই প্রসঙ্গেই একটি আলোচনা আমরা প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করে উদ্ধৃত করতে ইচ্ছুক। আলোচনাটি খুব একটা প্রাচীন নয়। এরিক জন আর্নেস্ট

হব্‌সবোম (১৯১৭-২০১২) 'London Review of Books' নামক একটি রিভিউ জার্নালে 'Palmiro Togliatti: A Biography by Aldo Agosti translated by Vanna Derosas and Jane Ennis' (পালমিরো তোগলিয়াত্তির জীবনী) এবং 'IL sarto di Ulm: Una possibili storia del PCI by Lucio Margi' (ইতালীয় ভাষায় ইতালীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস) গ্রন্থ দুটির সমালোচনার শুরুটা করেছেন এইরকম :

> The history of the 20th century Communist movements that never acquired State Power has been overshadowed by the extraordinary story of the rise and fall or self transformation of the regimes inspired by October Revolution. Within little more than 30 years of Lenin's arrival at the Finland Station, Russia had become a Superpower and one third of humanity was ruled by communist parties. There had been nothing like since the triumphal expansion of Islam in the Seventh century. Forty years later, all these regimes between the Siberian shores of the Pacific, the Baltic and the Adriatic had gone and the major Asian Communist Parties had recycled themselves into builders of capitalism. Except for two small and somewhat eccentric states, nothing remained of the hope that the world of the future would be one of centrally planned socialist societies.[৭]

ইতিহাসের পক্ষপাতহীন পাঠক ও পর্যবেক্ষক মাত্রেরই এই অনুভব আসা স্বাভাবিক। বামপন্থী ঐতিহাসিক হিসেবেই হবস্‌বোমের প্রসিদ্ধি। ২০১২ সালে গত হচ্ছেন তিনি। সময়ের বিচারে এই লেখাটি তাঁর একেবারে শেষ জীবনের উপলব্ধি। কোনো ভাবেই এই পর্যবেক্ষণের মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

ফুকোরও মনে হয়েছিল আসলে সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রনৈতিক বদলই ক্ষমতাতাত্ত্বিক বদল। নিজের বইতে ফুকো পাগলের এক নতুনতর সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন। খুঁজতে চাইলেন আসলে পাগল কে! সে কি কোনো ট্যাবু! ফুকো লক্ষ্য করলেন রাষ্ট্রের পাগলা গারদগুলোতে আসলে কারা থাকছে! যারা রাষ্ট্রের বা সমাজের বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত বিধানগুলো মানছে না তারাই। সেক্ষেত্রে তাদের শুশ্রূষার নামে রাষ্ট্র আসলে সেই ব্যবস্থা করছে যাতে তারা প্রচলিত শৃঙ্খলার সঙ্গে আঁটসাঁট করে খাপ খেয়ে যায়। অতএব রাষ্ট্রনীতি আসলে একটা বড়সড় ক্লিনিকের জন্ম দিচ্ছে, যার কাজই হচ্ছে কড়া হাতে সমস্ত বাসিন্দাকে নিজ প্রণীত ও প্রচারিত বিধানের মধ্যে বেঁধে রাখা। এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারছি 'রাষ্ট্র', 'হাসপাতাল', 'চিকিৎসা', 'পাগল', 'সমাজ' প্রভৃতি শব্দের চিরাচরিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থের সংসার ভেঙে যাচ্ছে। শুধু ভেঙে যাচ্ছে না, একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি ঠিক কোন পটভূমিতে দেরিদা নির্মাণ করছেন নিজস্ব দর্শনের ভিত্তিভূমি।

১৯৬২ সালে বহু মৃত্যুর প্রতিদানে জোড়াতালি দিয়ে হলেও আলজিরিয়া ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ হিসেবে আর না থেকে স্বাধীনতা অর্জন করল। ফ্রন্ট দি লিবেরেশন ন্যাশনালে (এফ.এল.এন)-এর হাতে ফরাসি সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে এক প্রকার বাধ্য হল। আলজিরিয়ান ফরাসি মানুষগুলো একটু সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার অর্জন করল, যার মধ্যে দেরিদাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদিও তার পরেও অস্থিরতা কমল না। শুরু হল ক্ষমতা দখলের আভ্যন্তরীণ লড়াই। এই পরিবেশেই একটা প্রান্তে এসে পৌঁছল দেরিদার সাংস্কৃতিক চেতনার পরিসর। এই বছরেই প্রকাশ পেল জাক দেরিদার প্রথম বই 'Edmund Husserl's Origin of Geometry : An Introduction'। হুসের্লের মূল বইটি জার্মান ভাষা থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেরিদা তাঁর গ্রন্থে যোগ করলেন একটি দীর্ঘ ভূমিকা। হুসের্লের আলোচনায় অর্থের দিক থেকে লিখনের ঊর্ধে কথনের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। দেরিদা তাঁর ভূমিকায় কিছুটা হুসের্লের অনুপন্থী হয়েও আলাদা হয়ে গেলেন। তিনি এখানেই জানালেন, কথনবিশ্বে নিয়মিত যে অর্থের শারীরিক উৎসার ঘটে চলেছে, এবং তার মাধ্যমে যে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের ইমারৎ নির্মিত হয়ে চলেছে, তার আয়ুও সীমিত এবং অস্থির। আমরা এখান থেকেই দেরিদার চিন্তারাজ্যের প্রাথমিক অভিমুখটুকু অনুধাবন করতে শুরু করি। বইটি ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে ১৯৭৮ সালে।

দেরিদা ধীরে ধীরে ফ্রান্সের আঁভা-গার্দ সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। ১৯৬৫ সালে যখন তিনি একোলে নর্মাল সুপিরিয়রে দর্শনের অধ্যাপনা

করছেন, তখন 'Tel Quel' (১৯৬০-১৯৮২) নামের একটি আঁভা-গার্দ সাহিত্য পত্রিকার অন্দরমহলে প্রবিষ্ট হন। পত্রিকাটির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতা চিলেন ফিলিপ সোলারেস (১৯৩৬-)এবং জাঁ এডের্ন হাল্লিয়ার (১৯৩৬-৯৭)। মুলত প্রবন্ধ পত্রিকা ছিল এটি। অবয়ববাদী নানা প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমিক উদ্বর্তনে উত্তর-অবয়ববাদী চিন্তা এবং বিনির্মাণবাদী চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধও নিয়মিত প্রকাশ পেতে থাকে এই পত্রিকায়। ১৯৮২ সালের পর এই পত্রিকার আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। সোলারিস ১৯৮২ সালে পত্রিকাটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে 'L'Infini' পত্রিকাটি প্রকাশ শুরু করেন। রোঁলা বার্ত, মিশেল ফুকো, মরিস ব্ল্যানকট, পেরি বউলেজ, জাক দেরিদা, জাঁ কায়রোল, জাঁ পিয়েরি ফায়, সোসানা ফেলম্যান, পেরি গৌতাত, জুলিয়া ক্রিস্টেভা, মারসেলিন প্লেনেত, মরিস রোচ, ফিলিপ সোলারিস, ফিলিপ জোসেফ সালাজার, উমবার্তো একো প্রমুখ দিকপাল দার্শনিক ও সাহিত্যবোদ্ধা নিয়মিত এই পত্রিকায় অবতীর্ন হয়েছেন। এই তথ্য থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি দেরিদার চারপাশে কী ধরণের বৌদ্ধিক চর্চার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত আর একটি তথ্যও আমাদের উল্লেখ করতে হয়। বামপন্থী ভাবধারার এই পত্রিকাটি ১৯৭১ সালের পর থেকে ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি তার অনাস্থা প্রকাশ করে। সরাসরি মাওবাদের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। ফিলিপ সোলারিস, মারসেলিন প্লেনেত, রোঁলা বার্ত, জুলিয়া ক্রিস্টেভা ১৯৭৪ সালে চিন সফরে যান। এই সময় থেকেই দেরিদা এই পত্রিকার সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন। আগেই বলেছি দেরিদা বা ফুকোরা রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে স্বপ্নের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের বিষয়টি আর বিশ্বাস করতেন না নানা কারনেই। তবে দেরিদার ভাবনায় বামপন্থী আদর্শের ক্রমবিবর্তনটি আমাদের গোচরে আসে বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে।

১৯৬৬ সাল ফরাসি দর্শন-সাহিত্য-সমালোচনার খুবই উর্বর সময়। এই সময় প্রকাশ পাচ্ছে লুই আলথুজেরের (১৯১৮-৯০) 'For Marx', এমিল বেনভেনিস্টের (১৯০২-৭৬) 'Problems of General Linguistics', জাক লাঁকার 'Ecrits', মিশেল ফুকোর 'The Order of Things'[৮], রোঁলা বার্তের 'Critique Et Verite'[৯] প্রভৃতি বই। লাঁকার বই গড়ে তুলল অপর ভাবনা (Otherness), বিষয়ী ভাবনা, লিঙ্গ পার্থক্য, উপভোগ, আইন প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রচলিত একরৈখিক অভিজ্ঞতার বিপরীত বহুরৈখিক তাৎপর্য। রোঁলা বার্তের বইটি আসলে রেমন্ড পিকার্ডের বার্ত-সমালোচনার প্রত্যুত্তর। দার্শনিকের কৈফিয়তও বলা যেতে পারে। বইটিতে বার্ত সমালোচনা ও সত্যের অন্তর্বয়নগত সম্পর্ক নিরূপণ করলেন। এই গ্রন্থটির প্রেক্ষিত ১৯৬৩ সাল

হলেও ১৯৬৬ সালে প্রকাশের পরেই বার্তের নাম ফ্রান্সের বাইরের সাহিত্য-সমালোচক মহলেও ছড়িয়ে পড়ল। মিশেল ফুকোর বইটি ১৯৭০ সালে ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে। মানব-বিজ্ঞানের উৎস নিয়ে এক নিবিড় নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলেন এই গ্রন্থে ফুকো। সমালোচনার এক নবতর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গোচরে এল বইটির সৌজন্যে। বইটি শুরু হয়েছে ডিয়েগো রডরিগেজ ডি সিলভা ইয়ে ভালাজকুয়েজের (Diego Rodriguez de Silva y Valazquez, 1599-1660) একটি আলোচিত আঁকা 'লা মেনিনাস'-এর উপস্থাপন, এর সরলরেখাগুলির জটিল সংস্থাপন এবং এর গুপ্তরৈখিক বিন্যাসের বিশ্লেষণ দিয়ে। সামগ্রিক ভাবে এগুলির আবেদনকে ফুকো লগ্ন করেছেন মানব ইতিহাসের কালক্রমিকতার সঙ্গে। গড়ে তুলেছেন নিজের আলোচনার জ্ঞানতাত্ত্বিক (Epistemological) ভিত্তিভূমি তথা বিজ্ঞানভিত্তিক ডিসকোর্স। সমসাময়িক এই সব সৃজনের একটা পৌনঃপুনিক ঊর্মিমুখরতা দেরিদা ধারণ করে চলেছিলেন আপন মননকেন্দ্রে। তারই ফলাফল আমরা লক্ষ্য করলাম পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হল দেরদার তিনটি বই : 'Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl's Theory of Signs', 'Of Grammatology', 'Writing and Difference'। এর মধ্যে প্রথম বইটি আগেই লেখা। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। বইটি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় বইটিকে বলা যেতে পারে দেরিদার বিনির্মাণবাদের ধাত্রীগ্রন্থ। বিশ্বসাহিত্য-সমালোচনায় দেরিদার এই বইটির মতো জনপ্রিয় ও বহুপঠিত বই তাঁর আর নেই। তবে এর জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব প্রাপ্য গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের। ১৯৭৬ সালে একটি মনোগ্রাহী কথামুখ সহ গ্রন্থটিকে মূল ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা ও প্রাচ্যে দেরিদার ভাবনার বহুপঠন ও অনুধাবন সম্ভবপর করে তুলেছেন গায়ত্রী। বিনির্মাণবাদ যেহেতু বর্তমান গবেষণার জ্ঞানতাত্ত্বিক স্তম্ভ, সেহেতু বইটি নিয়ে পরবর্তীতে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করতে চাই। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা শুধু বিষয়সঙ্গতি রক্ষা করে প্রেক্ষিতটুকু পর্যালোচনা করে গেলাম। তৃতীয় বইটি আসলে দেরিদার ১৯৬৩ সালের ৪ মার্চ প্রদত্ত বক্তৃতার সংকলন। ফুকোর উন্মাদ সংক্রান্ত ভাবনাই এই আলোচনার প্রেক্ষণ বিন্দু। এই বইটির মূল গুরুত্ব শুধু এর পাঠক প্রতিক্রিয়া নয়। বরং আমরা দেখেছি এই আলোচনাই ফুকোকে আরও দুটি গ্রন্থ রচনার প্রেরণা দিয়েছিল। একটি ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'The Order of Things: An Archaeology of the Human Science', অপরটি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত

'The Archaeology of Knowledge'। দুটি গ্রন্থের মুখবন্ধে সে কথা ফুকো নিজেই জানিয়েছেন। ফুকো-দেরিদার এই পারস্পরিক ভাবনার আদান-প্রদান যে ফরাসি দর্শনকে অনেক সমৃদ্ধি দিয়েছিল, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেরিদার 'Of Grammatology' বাদ দিয়ে অপর দুটি বই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে যথাক্রমে ১৯৭৩ ও ১৯৭৮ সালে।

দেরিদার বিনির্মাণবাদ ইউরোপের থেকেও আমেরিকার সাহিত্য-সমালোচক মহলে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এরই মধ্যে ফরাসি প্রশাসনের প্রতি ফরাসি জনগনের বিরূপতা বারুদ পরিস্থিতি নির্মাণ করেছিল। তার বহিপ্রকাশ ঘটল ১৯৬৮ সালে। ফ্রান্সে সংগঠিত হল বিপুল ছাত্র বিক্ষোভ। ছাত্র মিছিলে গল-সরকার গুলি চালনা করলেন। নির্লজ্জ নৃশংস দানবীয় রাষ্ট্রিক অত্যাচারে সেই বিক্ষোভ খুব বেশি আয়ু পেল না। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সামনে নিরস্ত্র ছাত্র প্রতিরোধ খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। ফুকো থেকে দেরিদা, সমকালীন সচেতন সমাজ-ভাবুকদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি ছিল ছাত্র আন্দোলনের প্রতি। আপাত ব্যর্থ এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা ফরাসি জনজীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু ফুকো বা দেরিদার মতো দার্শনিকদের মন থেকে ইস্তেহার উদ্ধৃত বামপন্থী বিপ্লবের গতিপথ সম্বন্ধে যাবতীয় বিশ্বাস অপসৃত হল। ইস্তেহারে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণিকেই একমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বহারা শ্রমিক তথা প্রলেতারিয়েত সেক্ষেত্রে বামপন্থী বিপ্লবের একক। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ছাত্র বিক্ষোভ এক নতুন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল বামপন্থী বিপ্লবের চিরাচরিত ধারণাকে। প্রমাণিত হল শ্রেণিস্বার্থে শুধু সর্বহারা শ্রমিক নন, সঙ্গত অধিকার রক্ষা ও আদায়ের বিপ্লবে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদানের অধিকার আছে ছাত্র-শিক্ষক-চাকুরিজীবী-আমলাসহ সবার। সেক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের আলাদা কোনো গুরুত্ব থাকে না। গুরুত্ব থাকে না বামপন্থী ইস্তেহার নির্দিষ্ট বিপ্লবের নির্দেশ ও রূপরেখার। এই আদর্শগত ভাঙা-গড়ার মধ্যেই এগিয়েছে দেরিদার চিন্তার বিবর্তন। এই সময় থেকেই দেরিদার মনে হতে লাগল অফিসিয়াল বামপন্থীরা আসলে দিগন্তহীন ভ্রান্তির সাগরে ভাসমান দিশাহীন অপ্রাসঙ্গিক বুদ্ধিজীবী। তাঁরা কেবল পুঁজিবাদের কাছে সমর্পিত হবার সময়জনিত বিভ্রাটে ভুগছেন এবং দ্রুত বিবর্তিত হতে চাইছেন, যাতে একটা মিথোজীবী সহাবস্থানে আসতে পারেন।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হল রঁলা বার্তের আর একটি উল্লেখযোগ্য বই 'S/Z'।[১০] বালজাকের 'Sarrasine' নামে একটি ছোটগল্পের অবয়ববাদী সমলোচনা এটি। কোথায় এবং কীভাবে গল্পে ব্যবহৃত সংকেতগুলো নানারকম অর্থগত সংগঠন গড়ে

তুলছে, এই বইটির মাধ্যমে তার একটি পাঠক প্রতিক্রিয়া তুলে ধরলেন বার্ত। বইটি পড়লেই দেরিদার গ্রামাটোলজি সংক্রান্ত নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রভাব বার্তের ওপর কতখানি পড়েছিল, তা আমরা অনুধাবন করতে পারি। এখান থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি দেরিদার ভাবনা সমসাময়িক চিন্তাবিশ্বে চালকের আসন পরিগ্রহ করছিল। ধারণাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৭১ সালে লিখিত এবং ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত পল দ্য ম্যানের 'Blindness and Insight' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে। সরাসরি দেরিদাপন্থী সমালোচক হিসেবে প্রথমেই যদি কোনো সাহিত্যতাত্ত্বিকের নাম করতে হয়, তবে পল দ্য ম্যানের (১৯১৯-৮৩) নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হবে। বইটিতে দেরিদাকে অনুসরণ করেই সাহিত্যের বহুত্ববাদী অর্থের ক্রম জায়মানতা দেখালেন ম্যান। আমরা তাঁর ব্যাখ্যায় বুঝতে পারলাম অন্ধত্ব এবং অন্তর্দৃষ্টির আপাত অর্থগত প্রভেদকে তিনি অস্বীকার করছেন। দুটি ভিন্ন অর্থদ্যোতক শব্দ আসলে একটা প্যারাডক্স। তারা আলাদা নয়, বরং অঙ্গাঙ্গী ভাবে জরিত থাকে। ম্যানের মতে পাঠকের সামনে দুটি অর্থের অবতারণা করা হয় কেবল মাত্র একটির শাসনে অন্যটিকে অস্বীকার করার জন্য (দেরিদা একেই বলেছিলেন 'বাইনারি অপোজিশন')। একটা বাক্‌কেন্দ্রিক অর্থের স্থায়ী রাজত্ব পাঠক স্বীকার করে নেয় নিজের অজান্তেই। ম্যানের মতে এটাই 'অন্ধত্ব'। সেই অর্থগত বাক্‌কেন্দ্রিকতার শাসন অস্বীকার করার সচেতন প্রচেষ্টাই হল 'অন্তর্দৃষ্টি'। আমরা বুঝতে পারছি দেরিদা আসলে একজন ব্যক্তি থেকে একটা স্কুলে পরিণত হচ্ছেন।

১৯৭২ সালে প্রকাশিত হচ্ছে দেরিদার তিনটি বই। 'Positions', 'Dissemination', 'Margins of Philosophy'। দেরিদা এই সময় বেশ পরিচিত পণ্ডিত মার্কিন-ফরাসি বিদ্যোৎসাহী মহলে। আরও বেশি বেশি করে তাঁর বইগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ হচ্ছে এই সময়। ফ্রান্স, আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও প্রাচ্যদেশগুলিতেও দেরিদাকে নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে। তাঁর 'Positions' হল তিনটি সাক্ষাৎকারের সংকলন। 'Dissemination', 'Writing and Difference' প্রভৃতি গ্রন্থে অর্থের বহুত্বতা নিয়ে যে গভীর নিমগ্ন আলোচনা করেছেন, এই সাক্ষাৎকারে সেগুলি সংক্রান্ত তাঁর অভিমুখ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। 'Margins of Philosophy' গ্রন্থে দেরিদাকে দেখি একটু বিদ্রোহী ভূমিকায়। প্লাতো, কান্ট, হেগেল, নীৎশে, হুসের্ল, হাইদেগার প্রমুখের হাতে পাশ্চাত্য দর্শনের যে প্রগতিধারা তথা দার্শনিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, বর্তমান গ্রন্থে দেরিদা সেগুলি ভাঙতেই বেশি আগ্রহ

প্রকাশ করেছেন। শিকাগো প্রেস প্রকাশিত এর ইংরেজি অনুবাদের ফোলিওতে পরিচিতি হিসেবে লেখা হয়েছে :

> In this densely imbricated volume Derrida pursues his devoted, relentless dismantling of the philosophical tradition, the tradition of Plato, Kant, Hegel, Nietzsche, Husserl, Heidegger-each dealt with in one or more of the essays. There are essays too on linguistics (Saussure, Benveniste, Austin) and on the nature of metaphor (White Mythology), the latter with important implications for literary theory.[১১]

বইটির পরিচিতিপত্রই বুঝিয়ে দেয় কী বিপুল বিস্তার নিয়ে দেরিদা নিজেকে হাজির করেছেন এখানে। আমরা বুঝতে পারি দেরিদা এই পর্ব থেকে আরও ভাঙছেন নিজেকে। নিজের মতামত গুলি আরও জটিলতর, বুদ্ধিদীপ্ত ও শানিত করছেন।

আমরা একথা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ফ্রান্সের পাশাপাশি মার্কিন চিন্তাবিদ মহলেও সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন তিনি। ফ্রান্স ও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই সময় পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা ও পাঠদানের জন্য আমন্ত্রিত হচ্ছেন। আমরা একথাও আগে উল্লেখ করেছি যে, ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বামপন্থার বিধিবদ্ধ ব্যাপারগুলি থেকে তিনি সরে আসছিলেন। ফলত এই সময় থেকে মার্কিন বুদ্ধিজীবী সংসর্গে বুর্জোয়া বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ তাঁর ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল। প্রারম্ভিক পর্যায়ের থেকে একটা আমূল বিবর্তন লক্ষ্য করা গেল তাঁর লেখালিখিতে। ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে ধনতান্ত্রিকতার প্রভাবে পুঁজিবাদের উপযোগী চিন্তা-চেতনার স্কুলগুলো ততদিনে অনেক শক্তপোক্ত। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ধাক্কায় সারা বিশ্বে যেভাবে বাম-সাহিত্যের জোয়ার উঠেছিল, তার একটা প্রতিস্পর্ধী এলাকা এই চিন্তাবিদেরা ততদিনে গড়ে তুলতে পেরেছেন। এই বুর্জোয়া সাহিত্য ও সমালোচনার ধার, ভার ও গ্রহণযোগ্যতা বাম-সাহিত্য-সমালোচনার থেকে তো কম হলই না, বরং তারা বাম-সাহিত্য-সমালোচনার অসম্পূর্ণতা ও পরিণামশূন্যতা অনেকাংশে প্রতিপন্ন করতে পেরেছেন। ইতোমধ্যে একটা অংশের লেখক ও সমালোচক বামপন্থী চিন্তার শূন্যতার সুযোগে উত্তর-মার্ক্সবাদী স্কুল গড়ে তুলতে সচেষ্ট হচ্ছিলেন। জাঁ বদ্রিলারের 'The Mirror of Production' বইটিতে এই উত্তর-

মার্ক্সবাদের স্পষ্ট প্রক্ষেপণ লক্ষ্য করি আমরা। বামপন্থী সাহিত্যে 'মানুষ'-কে বাম-আদর্শের সঙ্গে সমীকৃত করে দেখানোর চলন শুরু হয়েছিল গোর্কির কাল থেকে। বলা হচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে 'মানুষ'ই প্রথম, মধ্যম ও শেষ। নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখন মার্ক্সবাদকে অবান্তর করে তোলার আয়োজন চলছে, তখন সেই পূর্ব-সংজ্ঞায়িত 'মানুষ'-কেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হল। বলা হল পুরাতন সেই বামপন্থী 'মানুষ'-টি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে বিবর্তিত হতে না পেরে অচল হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। জন্ম নিয়েছে নতুন 'মানুষ'। ফুকোর মতো প্রাক্তন বামপন্থী চিন্তাবিদদের অনেকেই বামপন্থীদের অফিস-সর্বস্ব রেজিমেন্টেড পার্টি হয়ে ওঠাটা সহিষ্ণুতার সঙ্গে মেনে নিতে পারেননি। ফলত তাঁরা দার্শনিক ঐতিহ্যকে সরাসরি অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাহীন বামবিরোধী হয়ে উঠলেন। আপন মতামতে মার্ক্সবাদকে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক মৃত একটা মতবাদ হিসেবে ঘোষণা করলেন। দেরিদা এতখানি সমসাময়িকতায় আচ্ছন্নও হননি, তাঁর লেখালিখিতে এতখানি অসহিষ্ণুতাও আমরা দেখি না। বরং দেরিদা এই সময় অনেকখানি মনোনিবেশ করেছেন তাঁর এতাবৎ প্রাপ্ত দার্শনিক দৃষ্টিকোণকে আরও জটিলতর অন্তর্বয়নের মধ্যে চালিত করার কাজে। ছুঁতে চাইছেন বহুত্বতার নতুন নতুন সীমান্ত।

তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত 'Glas' বইতে।[১২] হেগেলের দর্শনচিন্তা ও জাঁ জেনের আত্মজীবনীর মিলিত একটি বিনির্মাণবাদী পাঠ এই বই। অদ্ভুত এক লিখন পদ্ধতি এবং তদনুসারী মুদ্রণ সজ্জারীতি ব্যবহার করেছেন দেরিদা। বইটি দুটি সারণিতে লেখা। সারণির বামদিক ধরে আলোচনা চলেছে হেগেলের দার্শনিক অভিব্যাক্তির। আর ডান দিক ধরে চলেছে জাঁ জেনের আত্মজীবনীকে নিজস্ব পদ্ধতিতে পাঠ। সারণিগুলির মাঝে আবার চতুষ্কোণের আকারে সম্পৃক্ত করেছেন উদ্ধৃতি, অভিমত, প্রান্ত-নোট ইত্যাদি। বইটি পড়ে আমাদের মনে হয়েছে প্রচলিত লিখন ও মুদ্রণ-সজ্জারীতিকে প্রথমে খুব নিষ্ঠুর ভাবে ভেঙেছেন দেরিদা। লেখার শুধু অবয়বে নয়, বিষয়ের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই ভাঙনের অভিঘাত। তার পর পাঠকের হাতে ছেড়েছেন এমন ভাবে যেন পাঠক পাঠান্তে জারি রাখে সেই ভাঙনক্রিয়া। দুটি কলামে দুটি ভিন্ন বিষয় উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্যই সম্ভবত একটি বিষয় অপর বিষয়ের বিরোধিতা করে নিজেদের মধ্যে অর্থের একরৈখিক অভিব্যক্তির ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলে। বিনির্মাণবাদের মূল কথাও সেটা। এভাবেই নতুন নতুন অবয়বের অনুসন্ধান করে চলেছেন দেরিদা। আরও জটিলতর হচ্ছে তাঁর অবলোকন।

১৯৭৫ সালে দেরিদা নিজেকে যুক্ত করছেন দর্শন পাঠের ফরাসি নিয়ামক সংস্থা GREPH (Le Groupe de Recherche sur L'Enseignement Philosophique)-এর সঙ্গে। এই সময় দেরিদা পাশ্চাত্য চিন্তকমহলে বেশ প্রতিষ্ঠিত একটি নাম। ফরাসি সরকারের সমীহের নজর ও আদায় করতে পেরেছেন। পরের বছর গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'Of Grammatology' ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাঁকে আরও পরিচিত করে তুলছেন। এই সময় থেকে দেরিদা স্বয়ং তাঁর লেখার অনুবাদকদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ গড়ে তুলছেন। দেরিদাপন্থী আলোচনারীতি একটা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি লাভ করছে। ১৯৮০ সালে ইউনিভার্সিটি অফ নেব্রাসকা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় দেরিদার আর একটি বিখ্যাত বই 'The Archeology of the Frivolous: Reading Condillac'। ১৭৪৬ সালে ফরাসি দার্শনিক কনডিলাক্ (১৭১৪-৮০) মানব বুদ্ধির উৎসার নিয়ে নিজের অভিমত জ্ঞাপন করে একটি প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশ করেন। দেরিদার গ্রন্থটি কনডিলাকের অভিমতের একটি বিনির্মাণবাদী পাঠ। বলা যেতে পারে অষ্টাদশ শতকের কনডিলাককে বিশ শতকের নতুনতর ভাবনায় আবিষ্কার করেছেন দেরিদা।

একথা আমরা বার বার উচ্চারণ করেছি দেরিদার সময় অবিরল অভিঘাতের সময়। বার বার বদলেছে তার রৈখিক গতিপ্রকৃতি। অস্থির সময়ের আন্দোলনে বারবার দেরিদা নিজেও আন্দোলিত হয়েছেন। বারবার জড়িয়ে পড়েছেন তাত্ত্বিক বিতর্কে। আটের দশকের শেষ ভাগ থেকে তার প্রতিভাস আবারও আমরা লক্ষ্য করলাম। ১৯৭৫ সালে জে.এল. অস্টিনের (১৯১১-৬০) একটি বই 'How to do things with words' নিয়ে লেগে গেল জন সার্লের (১৯৩২-) সঙ্গে প্রবল বিতর্ক। আর সেই বিতর্ককে ঘিরে আড়াআড়ি বিভাজন ও বিতর্ক দেখা দিল কিছু ইঙ্গো-আমেরিকান দার্শনিকদের সঙ্গে দেরিদাপন্থী দার্শনিকদের। অস্টিন ছিলেন সার্লের সরাসরি শিক্ষক। দার্শনিক সার্ল প্রভূত প্রভাবিত হয়েছিলেন অস্টিনের বিশ্লেষনী রীতিতে। সার্লের বেশিরভাগ লেখায় অস্টিনের রীতির প্রভাব দেখা যায়। বস্তুত পক্ষে অস্টিনকে নিয়ে সার্লের কাজ বিস্তৃত। সেখানে দেরিদা যখন আপন পদ্ধতিতে অস্টিনের কাজের বিশ্লেষণ করে অস্টিনের রীতিকে অস্বীকার করতে চাইলেন, তখন সার্ল দেরিদা সমালোচনায় নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। সরাসরি ঘোষণা করলেন :

> Derrida's writings are so obscure that it is too difficult to decipher for it to be taken seriously...

> With Derrida, you can hardly misread him, because he's so obscure.[১৩]

অস্পষ্টতার অভিযোগ এনে সরাসরি দেরিদাকেই নাকচ করে দিতে চাইলেন সার্ল। তাঁকে কেন্দ্র করেই একটা দেরিদা-বিরোধী গোষ্ঠী সক্রিয় হল ইঙ্গ-আমেরিকান সমালোচক মহলে। তাঁরা বলতে চাইলেন দেরিদা যে পদ্ধতির কথা বলছেন, তেমন কোনো পঠন পদ্ধতি আদতে হয়ই না। তাঁরা দেরিদার পথকেই সন্দেহের চোখে দেখতে চাইলেন। বলতে চাইলেন দেরিদার বিনির্মাণ আসলে একটা মস্ত বড় বাগাড়ম্বর। একটা প্রহেলিকা, যাকে বুঝতে না পারলেও ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই; কারণ ওইরকম কোনো পদ্ধতি আসলে হয় না। কিন্তু আগেই আমরা আলোচনা করেছি এই সময় দেরিদা বেশ শক্তপোক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত। ফলত দেরিদাকে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। দেরিদা স্বয়ং আপন লেখনিতে এবং দেরিদা সমর্থকরা এই বিরোধিতার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। পল দ্য ম্যান, জে. হিলিসমিল, হ্যারলড্ ব্লুম, জিওফ্রি হার্টম্যান, পিটার রলিন্স, জন ডি. কুপ্টো, ক্যাথারিন মালাবোউ দেরিদার পক্ষে কলম ধরলেন। তুলে ধরতে থাকলেন ক্রমবিবর্তিত বিনির্মাণবাদের বহুরৈখিক স্তরীভূত আলোচনা সম্ভার। পল দ্য মানের বিখ্যাত বই 'Allegories of Reading' এই প্রেক্ষিতেই লিখিত হয়।

নারী সংক্রান্ত মতামতের ক্ষেত্রে নীৎশে বরাবরই সমালোচিত হয়েছেন। বিশেষত নারীবাদীদের কাছে। কিন্তু নারী সম্বন্ধে নীৎশের মতামত আসলে যে বহুকৌণিক, দেরিদার ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'Spurs: Nietzsche's styles' বইটিতে সেটাই দেখা গেল। দেরিদা দেখালেন নীৎশে আসলে নারীকে সত্যের দুর্জ্ঞেয়তার সঙ্গে অভিন্ন করেছেন। সে কারণেই নারীকে জানা যায় না। তার প্রতি যোদ্ধার মতো অভিযান করা যায়। এই বইটি নিয়েও প্রবল বিতর্ক হল। কিন্তু এটাও সত্য দেরিদা কিছুটা হলেও নীৎশে সম্বন্ধে নারীবাদীদের প্রচলিত অভিযোগ প্রশমিত করতে পেরেছিলেন। নীৎশেকে আবিষ্কার করেছিলেন নতুন ভাবে। দেরিদার নিরন্তর সাধনা উত্তর-অবয়ববাদকে যখন পুরোদস্তুর প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতেই ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় উত্তর-আধুনিকতার দলিল স্বরূপ জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওতারের (১৯২৪-৯৮) সারা জাগানো বই, 'The Postmodern Condition: A Report on Knowledge' ('La Condition Postmoderne: Report Sur le Savoir')। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সাহিত্য-সমালোচনার যে অনেকান্ত তল নির্মিত হচ্ছিল, একাধিক খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল বহুত্ববাদী সমালোচনা, লিওতার তার নিপুণ পথরেখা

আঁকলেন তাঁর বইটিতে। দেরিদাও ভাঙছিলেন নিজের অনেকান্ত সমালোচনা রীতিকে। তার প্রমাণ আমরা পেলাম ১৯৮০ সালে তাঁর ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ, 'The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond'-এর মধ্যে। একই সঙ্গে বিস্ময় ও বিভ্রান্তি উপহার দিলেন এই বইটির সৌজন্যে দেরিদা। বিস্ময় একারণে যে তিনি কত দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছেন বিস্তীর্ণ পাঠ পরিসরে। বিভ্রান্তি একারণে যে এত বহুমাত্রিক স্ফুলিঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর চিন্তারাশি যে, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো দুষ্কর হয়ে উঠছে সাধারণ পাঠকের পক্ষে। এর অভিঘাত যখন কাটিয়ে উঠতে পারেনি তত্ত্ববিশ্ব, তারই মধ্যে ১৯৮২ সালে দেরিদার ১৯৭২ সালে প্রকাশিত বই 'Margins of Philosophy'-র ইংরেজি অনুবাদ হাতে চলে এল। বিনির্মাণবাদের এতাবৎ চলে আসা ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ এক বিপরীত পাঠ হাজির করলেন দেরিদা পাশ্চাত্য সমালোচকদের সামনে। নিজেকেই যেন নতুন ভাবে তুলে ধরলেন এক প্রতিস্পর্ধী অবস্থান গ্রহণ করে।

১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হল দেরিদার আর একটি আলোচিত বই 'The Truth in Painting', যেটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন জিওফ্রি বিনিংটন ও ইয়ান ম্যাকলিয়ড। চিত্রের বহুরৈখিকতা সাহিত্যপাঠ পদ্ধতির সমীকৃত সত্য হিসেবে দেখাতে পারলেন দেরিদা। ২০০৪ সালের ৮ অক্টোবর গত হয়েছেন দেরিদা। এই সময়কালের মধ্যে আয়ুষ্কালের শেষ প্রহর পর্যন্ত চিন্তাশীল ও সৃষ্টিশীল ছিলেন তিনি। তাঁর জীবৎকালে শেষ প্রকাশিত বই হল, 'Rogues: Two Essays on Reason'। বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন পাস্কাল-অ্যানি ব্রল্ট ও মিশেল নাস। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পরেও সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ সংকলন, বক্তৃতার সংকলন মিলে কমবেশি সতেরটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি বই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এত বিপুল সৃজন ও ততোধিক বিপুল পর্যালোচনা পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে খুব কম জনেরই নামের পাশে আমরা লিখতে পারি।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি জাক দেরিদার সৃজনবিশ্ব ও সমকালিক সাহিত্যিক-রাজনৈতিক-আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত। জানতে পেরেছি ঠিক কোন প্রতিবেশ দেরিদার চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। জানতে পেরেছি দেরিদার নিজস্ব সৃজনের মধ্যেই বারবার নিজেকে ভাঙা-গড়ার ইতিবৃত্ত। সমকালীন সাহিত্যিক বিতর্কসহ আর কী কী বিষয় দেরিদার চিন্তায় বাঁক সৃষ্টি করেছে, তা আমরা এখানে

আলোচনা করেছি। চিন্তানায়কদের চিন্তার স্রোত কোনো স্থান-কাল-প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। তাই দেরিদার চিন্তার মূল আঁকড়গুলো সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে হলে তাঁর সমকাল ও সৃজন-সম্ভারে মনোনিবেশ আমাদের করতেই হত। বর্তমান পরিচ্ছেদটি হল সেই ভিত্তিভূমি, যার ওপর সমগ্র গবেষণাকর্মটির অগ্রগতির অভিমুখ নির্ভর করছে। এই আলোচনা ব্যতিরেকে দেরিদাকে সম্যক আত্মস্থ করা সম্ভব নয়। আগামী অধ্যায়গুলিতে বিনির্মাণবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা বারবার এই অভিজ্ঞতা ব্যবহারও করব।

দ্বি তী য় প রি চ্ছে দ

বিনির্মাণবাদ : পাঠপ্রক্রিয়া হিসেবে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

সমস্ত প্রজ্জ্বলিত প্রদীপেরই একটি সলতে পাকানোর ইতিহাস থাকে। বিনির্মাণ ও জাক দেরিদা বিংশ থেকে একবিংশ শতকের দার্শনিক মহলে অন্যতম আলোচিত নাম; আলোচিত ও বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা বিষয়। আলজিরিয়ার মানুষ জাক দেরিদা তিন ধরণের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলেন। ইসলাম, ইহুদি আর খ্রিস্টান। তিনি দেখেছিলেন সবাই একটাই সত্যের অস্তিত্বের কথা প্রচার করেন। অথচ একে অন্যকে অস্বীকার করেন। সংঘাতে লিপ্ত থাকেন নিয়ত। দেরিদার মনে হয়েছিল তাঁরা হয়ত নিজের নিজের অবস্থানে ঠিকই আছেন। বরং সত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা আছে। এক এক দল এক এক মাত্রাকে ধরে বসে থাকায় অন্য মাত্রাগুলি তাঁদের গোচরে আসছে না। এই সংঘাত বন্ধের প্রধান উপায়ই হল সত্যের কোনো একমাত্রিক ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বহুমাত্রার সন্ধান করা। এখানেই সম্ভবত বিনির্মাণের বীজটি ছিল। সেই বীজ পল্লবিত হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে। তাঁর মনে হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিতই হতে পেরেছে উগ্র জাতীয়তাবাদ, মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, নিজের দেশ, নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা, এক নায়কের ঈশ্বরপ্রমাণ শক্তির বিকাশ, এমন সব বিষয় যার কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, সেইসব আধিভৌতিক চিন্তা চর্চার ফলে। ইউরোপের অভিবাসন নীতির ঢেলে সেজে ওঠা, তাকে যুক্তিযুক্ত করে তোলার জন্য রাষ্ট্রনেতাদের আরবীয় ও ইহুদি ইমিগ্রেন্টদের বিরুদ্ধে লাগাতার প্ররোচনামূলক বক্তৃতায় এমন এক বোমার (যার কোনো সত্য ভিত্তি নেই) জন্ম হয়েছিল সাধারণ মানুষের মননে যে, সেটাই একটা অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধকে অর্ধ দশক ধরে চলা নরমেধ

যজ্ঞে পরিণত করেছিল। সময় ও ইতিহাসের মেধাবী দ্রষ্টা দেরিদা এখান থেকেই পাকিয়ে তুলেছিলেন তাঁর বিনির্মাণের দার্শনিক সূত্রাবলী।

পাঠ-প্রক্রিয়া হিসেবে বিনির্মাণের আত্মপ্রকাশ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর তাত্ত্বিক বীজ সন্ধান করতে গেলে আমাদের রাশিয়ার প্রকরণবাদের প্রতি প্রথম নজর পড়ে। ১৯১৪ সালে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষাতাত্ত্বিক সার্কেল। রোমান ইয়াকভসন হয়ে উঠলেন রাশিয়ার প্রকরণবাদী বা ফর্মালিস্ট সার্কেলের প্রধান প্রবক্তা। ১৯২০ সালে প্রাহা চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ইয়াকভসন অবয়ববাদী ভাষাতাত্ত্বিক সার্কেলের প্রধান হয়ে উঠলেন। চেকপ্রজাতন্ত্রে তখন অবয়ববাদী ভাষা ও সাহিত্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেছে। ১৯১৪ সালে মস্কোয় প্রকরণবাদী বা ফর্মালিস্ট দৃষ্টিকোণের সূচনা হয়েছিল শক্লোভস্কির পুরাতন শিল্প ভাবনার মৃত্যু ঘোষণার মধ্য দিয়ে। প্রকরণবাদী সমালোচনারীতি রাশিয়ায় মোটামুটি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রবহমান ছিল। এই সমালোচনারীতির প্রাথমিক বিধানগুলি ইউরিজ তিনজানভ (Jurij Tinjanov) এবং রোমান ইয়াকভসনই নির্ধারণ করেছিলেন।

ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণার পরপরই বিষয় ও বিষয়ীর গুরুত্ব শূন্য হয়ে গেছিল। পাঠের মধ্যে বিশ্লেষণের অন্য মাত্রা সন্ধান করছিলেন প্রকরণবাদীরা। কাব্যে তথা সাহিত্যে চিত্রকল্পবাদের অত্যধিক গুরুত্ব তাঁরা স্বীকার করলেন না। তাঁরা বললেন চিত্রকল্প আরও অনেক সাহিত্যিক উপাদানের (Texture) মধ্যে একটি সাহিত্যিক উপাদানমাত্র, যা কেবল সাহিত্যবস্তুকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করে। এর থেকে বেশি কিছু না। কারণ তা সাহিত্যকে কোনো বিশেষত্ব দান করে না। বরং তাঁরা সাহিত্যে বিশেষত্ব প্রদানকারী অন্যান্য উপাদান, যেমন উপমা, তুলনামূলক উক্তি, বক্রোক্তি, পুনরুক্তি, অতিশয়োক্তি, এগুলিকে অনেক বেশি প্রকরণ হিসেবে গুরুত্ব দিলেন। কারণ এগুলি সাহিত্যবস্তু, এমনকি শব্দেরও তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তোলে। প্রকরণবাদীরাই চেয়েছিলেন সাহিত্যের পঠনপাঠন হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁদের মতে শিল্প সাহিত্য হল পূর্বোল্লেখিত নানা উপাদানের মাধ্যমে প্রাত্যহিকতাকে ক্রমে অপরিচিত করে তোলার প্রক্রিয়া। তার জন্য স্রষ্টাকে সাহায্য নিতে হয় এক ধরণের ‘impeded form’-এর। এই অপরিচয়ের বাধাপ্রাপ্তিই পরিচিত সাহিত্যিক উপাদানকে অপরিচিত সাহিত্য করে তোলে। এই প্রক্রিয়াকে প্রকরণবাদীরা ‘estrangement’ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য কোনো দেবদত্ত বা স্বপ্নদত্ত প্রতিভার বিষয় নয়। এটি একটি অনুশীলনলব্ধ কৌশল। সাহিত্যে বা পাঠে ব্যবহৃত শব্দের আন্তর্সম্পর্কই প্রকরণবাদী সমালোচনার মূল অন্বেষণ। এই ভাবনাই ছিল বৈপ্লবিক।

তাঁরা সেই চেষ্টাই চালিয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের অভিমতের সঠিক পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা তাঁরা করে যেতে পারেননি। যেটা অবয়ববাদে সম্ভবপর হল। তাই বলা যায় অবয়ববাদ আসলে প্রকরণবাদেরই একটা উত্তরণ। ১৯৩০ সালের পর রাশিয়ায় প্রকরণবাদী চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালে জে. ভি. স্তালিনের মৃত্যুর পর মস্কো ভাষাতাত্ত্বিক সার্কেলে প্রকরণবাদী চর্চা নতুন করে শুরু হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে অবয়ববাদী ভাবনা সমগ্র পূর্ব ইউরোপ হয়ে ফ্রান্স ও জার্মানিতেও প্রসার লাভ করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই প্রকরণবাদী ভাবনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য সমালোচনার যে ট্রাডিশান তৈরি হয়েছিল, প্রকরণবাদী বিশ্লেষণ বা ফর্মালিস্ট অ্যাপ্রোচ তার প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ।

অবয়ববাদের ক্ষেত্র হল প্রকরণবাদের থেকে অনেক বিস্তৃত। তা শিল্প-সাহিত্যকে ছাড়িয়ে সমাজ ও রাজনীতির চলনেও সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাঁরা পর্যালোচনা করলেন সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা সুস্পষ্ট কাঠামো আছে। সেই কাঠামোটাকে বিশ্লেষিত করতে পারলেই বুঝতে পারা যাবে বিষয়টির সম্যক রূপ। এই কাঠামোর ধারণা না থাকলে বিশ্লেষণের মধ্যে দেখা যাবে এক ধরণের বিশৃঙ্খলা। আর সেই বিশৃঙ্খলাকে ঢাকতে বিশ্লেষক সাহায্য নেবেন আধিভৌতিক বা মেটাফিজিক্যাল শাসনের। এই অব্যবস্থা থেকে মুক্তি মিলতে পারে একমাত্র কোনো বিষয় সংগঠনের ছোট ছোট এককগুলিকে বিশ্লেষণ করলে। এই এককগুলিই হল অবয়ববাদীদের কাছে 'চিহ্ন' (Sign)। তার অবস্থান উপ্ত থাকে বিষয় আর বিশ্লেষকের সামূহিক গভীরতায়। তার বাহ্য শরীর হয়ে ওঠে 'চিহ্নায়ক' (Signifier)। ছবি, শব্দ, উচ্চারণ এই সবই সহজ করে বললে চিহ্নায়ক। সেই চিহ্নায়ক যে ভাবগত বা অর্থগত, আমরা যাই বলি না কেন, উপলব্ধি নিয়ে আসে, তাই 'চিহ্নিত' (Signified)। বিশ্লেষণের এই ত্রিমাত্রিকতাই অবয়ববাদের (Structuralism) মূল কথা। ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুর তাঁর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে একেই বলেছিলেন 'চিহ্নতত্ব' (Semiology)। ক্লড লেভিস্ট্রস তাঁর মিথ সংক্রান্ত আলোচনায় একেই সংযুক্ত করেছিলেন সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে সে কথা আমরা আলোচনা করেছি।

একথা এখানে আমরা বলে নিতে চাই, অবয়ববাদী আলোচনারীতি অনেকাংশে স্যোসুর দ্বারা প্রাণিত। স্যোসুরের মতোই সমষ্টির ভাষা-ভাবনা (La Lang) আর ব্যক্তির ভাষা-ভাবনার (La Parole) মধ্যে ব্যক্তির ভাষা-ভাবনা ও ব্যবহারকেই অবয়ববাদীরা অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তাঁরা দেখেছেন ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের কৌশলই পরবর্তী কালে সমষ্টির ভাষা ব্যবহারের কৌশলকে প্রভাবিত করে। ভাষার অর্থবোধের

যে ত্রিমাত্রিক নিয়মের কথা আমরা বলেছি, সেখানেও এই ব্যক্তি বিশেষের ভাষিক কৌশল অধিক প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্যই এই ত্রিমাত্রিক নিয়ম বিজ্ঞানভিত্তিক। অবয়ববাদীরা এই বিজ্ঞানভিত্তিক সমালোচনা রীতিতে প্রথম থেকেই ভরসা রেখেছেন।

অবয়ববাদে মূলত গঠনের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁদের কাছে ভাষার অংশ যে বাক্য, তা মূলত একটি সংগঠন ব্যতিত আর কিছুই নয়। সেই সংগঠনগুলি আবার নির্মিত হয় স্বনিম (Phoneme), বিস্বন (Alophone), রূপিম (Morpheme) ও রূপভেদের (Alomorph) সম্মিলনে। এই সম্মিলনে যারা পূরক (Complementary) অবস্থানে থাকে, তাদের পরিবর্তনে সামগ্রিক সংগঠনে অর্থবোধে কোনো বিরাট উনিশ-বিশ হয় না। কিন্তু পূরক সম্পর্ক না হলেই অর্থান্তর ঘটে যায়। এই ব্যাবধানগত সম্পর্কেই (Differentiated relation) জোড় দিলেন অবয়বাদীরা। 'দশটায় শেষ মেট্রো চলে যায় দমদম ছেড়ে' বাক্যটিতে 'দশটায়'-এর জায়গায় 'এগারটায়' লিখলেও খুব বেশি অর্থ পার্থক্য হয় না। প্রথমত 'এগারটায় শেষ মেট্রো...' বাক্যটি একই রকম বিশ্বাসযোগ্য। দ্বিতীয়ত দাশটার মেট্রো এগারটাতে ছাড়লেও 'শেষ মেট্রো'ই থাকে। এমনকি মেট্রোরেলটিতে সাধারণ রেক-এর বদলে বাতানুকূল রেক ব্যবহারও করলেও সেটা 'শেষ মেট্রো'ই থাকবে। এখন 'মেট্রো'-র জায়গায় যদি আমরা 'স্টেট বাস' লিখি বা বলি, তাতে অর্থ হয়তো কিছুটা বদলাবে। কিন্তু মূল কাঠামোটা একই থাকবে। কিন্তু 'মেট্রো'-র 'ম'-এর স্থানে যদি 'প', 'ল' জাতীয় ধ্বনিখণ্ড ব্যবহার করি, তখন কোনো অর্থ দাঁড়ায় না। একমাত্র তখনি সংগঠন তথা অবয়বটি ভেঙে পড়ে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে শব্দের বদলে (অবয়ব ভেঙে না পড়লে) অন্য শব্দের ব্যবহারে যে প্রভেদটুকু আমাদের চোখে পড়ছে, তা কেবল ব্যবধানগত শব্দ ও অর্থসম্পর্কের কারণেই ঘটে। শব্দ সম্পর্ক ও ব্যবধানগত অর্থসম্পর্ক নঞর্থক।[১] অর্থাৎ 'মেট্রো' বললে তার অর্থবোধ তখনি হবে, যখন একজনের মধ্যে এই জ্ঞান থাকবে, 'মেট্রো' হল সেই বস্তু, যা 'ট্যাক্সি' নয়, 'সাইকেল' নয়, 'ঠেলা গাড়ি' নয়। একারণেই নঞর্থক কথাটি আমরা উচ্চারণ করেছি। 'মেট্রো' হল 'Signifier' বা চিহ্নায়ক বা অর্থক; তার সম্বন্ধে অর্থের বোধ হল 'Signified' বা চিহ্নিত বা অর্থিত। এরা পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় থাকে। এই সংলগ্নতাটি নির্দেশাত্মক বা 'deterministic'। অর্থাৎ 'মেট্রো' বললে নির্দিষ্ট করে 'মেট্রো রেল'-কেই বুঝব। অন্য কিছু বোঝার ছাড়পত্র নেই।

উত্তর-অবয়ববাদে বিশেষত বিনির্মাণবাদে একেই বলা হল বাক্‌কেন্দ্রিকতা বা 'Logocentrism'। এই অনড় অর্থের শাসন থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই প্রকৃতপক্ষে অবয়ববাদ থেকে উত্তর-অবয়ববাদে উত্তরণ। উত্তর-অবয়ববাদীরা জানালেন এই

চিহ্নায়ক ও চিহ্নিতের মধ্যে যে আধিভৌতিক (Metaphysical) লগ্নতা, যা কিনা আমাদেরই নির্মিত, তা কার্যক্ষেত্রে একটা দ্বিবাচনিক বিপ্রতীপ (Binary Opposition) অর্থবোধের মধ্যে আমাদের বেঁধে রাখে। অর্থাৎ একটি শব্দ উচ্চারিত হলে সেই শব্দের অর্থবোধ হয় 'সাদা'('+'সাদা), নয় 'কালো'('-'সাদা) হবে, অথবা হয় 'মেট্রো'('+'মেট্রো), নয় 'বাস'('-'মেট্রো) হবে। একেই বলে বাইনারি অপোজিশন। এটা থাকলে অর্থবোধ করা সুবিধাজনক হয়ে পড়ে। কিন্তু একই সঙ্গে শব্দ তার অর্থগত বহুরৈখিক বিস্তার হারায়। এটা শুধু শব্দের ক্ষেত্রে নয়, একটা সামগ্রিক পাঠের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ আপনি 'মনসামঙ্গল' পড়ছেন; সেখানে আপনি মনসাকে হয় দেবী নয় হিংসুটে পিশাচিনী মনে করবেন। চাঁদ সদাগরকে হয় যোদ্ধা মনে করবেন, নয় অহংকারী উচ্চবর্ণের ধনকুবের মনে করবেন। বাইনারি অপোজিশনের যে কোনো একটি আপনাকে বেছে নিতে দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তত্ত্ববিশ্বে উত্তর-অবয়ববাদীরা এই বাইনারি অপোজিশনের উল্টো স্রোতে ভেসে বহুরৈখিকতাকেই মুক্ত করতে চাইলেন। আর ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই জাক দেরিদার বিনির্মাণবাদ একটি মাইলস্টোন হয়ে আবির্ভূত হচ্ছে তত্ত্ববিশ্বে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা সেই বিনির্মাণবাদের তত্ত্বগত দিকগুলি অনুসন্ধান করব।

বিনির্মাণ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তার মতাদর্শগত ভিত্তিভূমিটা আমাদের সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে হয়। আর এর জন্যও আমাদের তদ্গত হয়ে পাঠ করতে হবে সক্রেটিস থেকে বিংশ শতকীয় পাশ্চাত্য দর্শনের গতি প্রকৃতি। দেরিদা লক্ষ্য করেছিলেন, সক্রেটিস থেকে জাঁ জাক রুশো, প্রত্যেকেই লিখনের থেকে বাচনের স্থান উঁচুতে রেখেছিলেন। সক্রেটিস একারণেই লিখিত কিছু রেখে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন বাণীর মধ্যে বক্তার যে ব্যক্তিত্ব ধরা পরে, অভিব্যক্তির যে উচ্চগ্রাম বাঁধা হয়, তা লিখনের মধ্যে অনুপস্থিত। রুসোও একই মতের অনুসারী। দেরিদা বিস্তারিত ভাবে রুসোর মত বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'Of Grammatology' গ্রন্থে। রুসো মনে করেছেন মানবিকতা ধ্বংস হয়েছে মানব সভ্যতার হাতেই। বিজ্ঞান নির্ভর ধনবাদী মানব সভ্যতার যে শোষণবৃত্তি, তার প্রয়োজনেই মানুষ ভুগেছে। মানুষ যত নিখুঁত হয়েছে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে, ততই তার প্রকৃতিদত্ত সারল্য নষ্ট হয়ে গেছে। বেড়েছে অন্যকে বঞ্চনার প্রবণতা। বাচনিক বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়েছে লিখনের জটিলতায়। রুদ্ধ হয়েছে মানুষের মুখোমুখি আলাপনের পথ। লিখনের বিকল্পে মানুষ পেয়েছে অসত্যের আবরণ। রুশো মনে করেছেন প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যথাযথ অবস্থানে ছিল। বিজ্ঞান-সভ্যতা তাকে অপ্রাকৃত অবস্থানে বিচ্যুত করেছে। অর্থাৎ

এখানেও চলে আসছে সেই বাইনারি অপোজিশনের কথা। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক। কিন্তু সত্যি কি এই ভাবে দুটি জিনিসের মধ্যে আড়াআড়ি লাইন টেনে দেওয়া যায়? দুটিই কি একে অপরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত নয়? বিজ্ঞানের পরিচালক, আবিষ্কর্তা থেকে ফলভোগী কি প্রাকৃতিক মানুষ নয়? দৃষ্টান্ত হিসেবে দেরিদা লেডি শেলির 'Frankenstein' এর কথা তুলে ধরলেন। প্রাকৃতিক মানুষের প্রাকৃতিক মৃত্যু হওয়ার পর অপ্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সৌজন্যে আর একটি জীবন লাভ তো অপ্রাকৃতিক ঘটনা। অথচ কী অদ্ভুত ভাবে তার মধ্যে নিঃসঙ্গতা, কামনা-বাসনা, প্রতিহিংসার মতো প্রাকৃতিক গুণগুলি আবর্তিত হয়েই চলেছে। দেরিদার মনে হয়েছে লিখনের উপর বাচন, অপ্রকৃতির উপরে প্রকৃতির এই অবস্থান ঘোষণা আসলে অযৌক্তিক তথা 'Arbitrary'। সর্বোপরি রুশো নিজেও সমস্ত বয়ান লিখিত আকারে পেশ করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'Confession' তাঁর নিজের অনুসিদ্ধান্তকেই খণ্ডন করে বলে মনে করেছেন দেরিদা।

ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুরও লিখনের উপর বাচনকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'Discourse'। সেই ডিসকোর্স চিহ্ন-চিহ্নায়ক-চিহ্নিত, এই ত্রিমাত্রিক গঠনে নির্মিত এবং অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। এখন আমরা যদি চিহ্ন-চিহ্নায়ক-চিহ্নিতের সাধারণ সম্পর্ক পর্যালোচনা করি তাহলে কী পাব তা দেখে নিতে পারি নীচের চিত্রে :

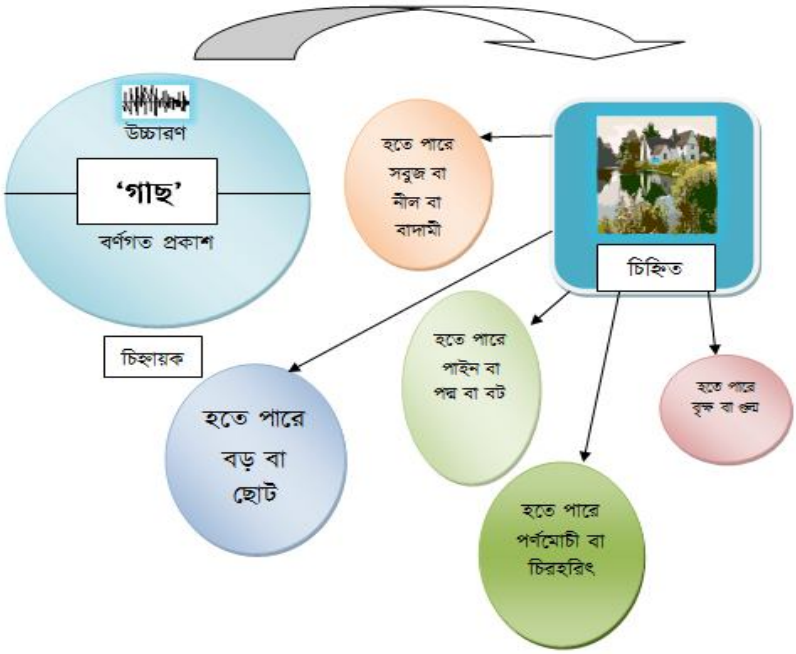

দেখা যাচ্ছে 'গাছ' এই চিহ্নায়ক দিয়ে যে ধারণা তৈরি হয় তা স্থিতিশীলও নয়, এক মাত্রিকও নয়। অর্থাৎ 'চিহ্নায়ক' ও 'চিহ্নিত'-এর অর্থগত লগ্নতা অত্যন্ত দুর্বল।

দেরিদা দেখালেন বাচনে চিহ্নায়ক ও চিহ্নিতের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাকে স্যোসুরের অনুসরণে অবিচ্ছেদ্য বা অবিনশ্বর ভাবার কোন কারণ নেই। ভাবলে সেখানে বিষয়ীর গুরুত্ব রাজার আসন দখল করার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে, যা অযৌক্তিক বা 'Arbitrary'। এই প্রসঙ্গেই দেরিদা উচ্চারণ করেছেন একটি নতুন পরিভাষা 'DIFFERANCE' ('ডিফারন্স', 'ডিফারেন্স' নয়)। স্যোসুর যেখানে বলছেন ভাষা হল চিহ্ন-চিহ্নায়ক-চিহ্নিতের সংগঠন, অর্থাৎ 'বিড়াল' বললে যেমন একদিকে 'কুকুর', 'মানুষ' 'মাদুর', 'রেল গাড়ি' বোঝাবে না, অথচ তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক বোঝাবে, সেখানে দেরিদা বলছেন 'বিড়াল' বললে যেমন বোঝাবে না 'বড় বিড়াল', 'ছোট বিড়াল', 'কালো বিড়াল', 'সাদা বিড়াল', তেমনি বোঝা দুষ্কর ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় 'বিড়াল' শব্দটি উচ্চারণ হলে তার সঙ্গে অন্য শব্দগুলির সম্পর্ক। এই পার্থক্য (Difference) তথা সম্পর্কগুলো বোঝা সম্ভব 'ডিফারন্স'-এর বোধ থেকে। দেরিদার মতে :

> Differance exists between signs and it is a systematic play between signs.[১৪]

'ডিফারন্স' নিয়ে বলতে গিয়ে দেরিদা ভাষা মধ্যস্ত আভাসের (Traces) কথা বলেছেন, যা সুপ্ত অবস্থায় চিহ্নের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে, অথচ মূর্তি পায় না। অর্থাৎ 'বাড়ি' শব্দটি উচ্চারণ হলে তার ভিতরেই পাকা, কুঁড়ে, নিজের, ভাড়ার, দেশের, কোয়ার্টার এইসব আভাস বা ট্রেসগুলো থেকে যায়। কিন্তু প্রকাশ পায় না। তাই দেরিদার মতে চিহ্নকে নির্বিকল্প ভাবা উচিৎ না। এই ট্রেসগুলোকেই দেরিদা 'ডিফারন্স' বলেছেন। এখানেই দেরিদার ভাষা চিন্তার মৌলিকতা। এখানেই তিনি বাচন-লগ্ন অর্থের একাধিপত্য কাটিয়ে উঠছেন।

জাক দেরিদা সারা জীবনে চল্লিসটি বই লিখেছেন, যার অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে তিনটি শব্দের বিচার বিশ্লেষণ। সেগুলি হল 'Logocentrism', 'Deconstruction' এবং 'Aporia'। এর মধ্যে প্রথম দুটি শব্দ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখন তৃতীয় শব্দ 'অ্যাপোরিয়া' হল গ্রিক শব্দ, যার প্রকৃত অর্থ 'ধাঁধাঁভুক্তিকরণ' বা 'Puzzlement'। দেরিদা সমস্ত কিছুতেই ছিলেন উল্টো স্রোতের সাঁতারু। যেখানে সাধারণ মানুষ দ্বিধা, ধাঁধাঁগ্রস্ত হওয়াকে দুর্বল মানসিকতার পরিচায়ক বলে মনে করেন, সেখানে দেরিদা মনে করেন ধাঁধাঁগ্রস্ততা সবল মনের পরিচায়ক। তিনি যুক্তিতে দেখিয়েছেন যাঁরা অধিক পরিমানে ধাঁধাঁর সম্মুখীন হয়ে সেগুলি সমাধান করতে পারেন, আর আমরা যদি তাঁদের অধিক আই.কিউ (Intelligence Quotient)

সম্পন্ন ব্যক্তি ধরি, তবে ধাঁধাঁগ্রস্ত হওয়াকে দুর্বল মানসিকতার পরিচয় ধরা হবে কেন! এই ধাঁধাঁগ্রস্ততা ও সংশয়ই বাক্‌কেন্দ্রিকতার শাসন অস্বীকার করার শক্তি দেয় বলে মনে করেছেন দেরিদা। তাই 'অ্যাপোরিয়া' দেরিদার মতে 'ডিকন্সট্রাকশন'-এর কেন্দ্রীয় প্রণোদনা।

জাক দেরিদা যে ডিকন্সট্রাকশনের কথা বলেছিলেন তার সঠিক বাংলা পরিভাষা কী হতে পারে তা নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। বিনির্মাণ, অবিনির্মাণ, ভাঙ্গন প্রভৃতি অনেকগুলি পরিভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[২] পরিভাষাগত সঠিক বিকল্প খুঁজে বেড়ানো বর্তমান গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য নয়। তবু বিষয়টির একটা যুক্তিপূর্ণ সমাধান না হলে গবেষণাকর্মটি প্রথমেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে। তার কারণ প্রথমেই একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; সমালোচকদের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি তাঁরা বিনির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণের মধ্যে থাকা পার্থক্যটি ধরতে পারেননি। তার ফলে তাঁরা বিনির্মাণের আলোচনাই এমন ভাবে সাজিয়েছেন যে, সাধারণ পাঠকের এই দুটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে থাকা পার্থক্যটি হৃদয়গ্রাহ্য না হয়ে বরং ভ্রম উৎপাদন হবে যে, এই দুটি বিষয় বুঝি একই। ফলত তাঁরা এটাও মনে করতে পারেন যে পুরাতন পাঠ বা টেক্সটকে ভেঙে নতুন টেক্সট গড়ে তোলাটাকেই বুঝি বলে বিনির্মাণ। তাই তাঁদের কাছে বিনির্মাণ আসলে আর একটা নির্মাণ, যা ভাঙনের পথ পরিক্রমা করে জন্ম নেয়। শ্রদ্ধাস্পদ সমালোচক অধ্যাপক অমল বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে নবেন্দু সেন, অনেকেই এই পার্থক্য নিয়ে তেমন আলোকপাত করেননি। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেও কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধান সূত্র সরল ভাবে আমাদের জন্য তুলে ধরেননি। অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারও এ বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার করেননি।

বিগত দিনগুলিতে এবিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করে বুঝেছি পাশ্চাত্যে দেরিদাপন্থী সমালোচক এবং দেরিদা স্বয়ং খুব স্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চেয়েছেন, 'ডিকন্সট্রাকশন' বলতে আসলে তাঁরা কী বোঝাতে চাইছেন। তাঁদের মতে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য, এতাবৎ কালের সাহিত্য-শিল্পকে দেখার, পর্যালোচনা করার, সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে একটা মধ্যযুগীয় রীতি অনুসৃত হয়ে চলেছে। সেখানে অর্থের বোধ, শব্দ চয়ন, শৈলী নির্ধারণ সবক্ষেত্রেই বিষয়ীর মধ্যে একটা দ্বিবাচনিক বিপ্রতীপ পক্ষপাতিত্ব কাজ করেছে। যেমন ভালো ও খারাপ, আলো ও অন্ধকার, সাদা ও কালো, পাপ ও পুণ্য, আশিস ও অভিশাপ এইরকম। দেরিদা একেই 'Binary Opposition' বলেছেন। এদের মধ্যে যে

অনতিক্রম্য একটা সীমারেখা এতদিন বজায় থেকেছে, আর তার সৌজন্যেই পাঠের একটা অনড় অর্থের তল নির্মিত হয়েছে এবং শাসন চলেছে পাঠক-উপভোক্তার উপরে। পাঠক তাকে প্রশ্ন করার ছাড়পত্র পায়নি। একটা বাক্‌কেন্দ্রিকতা একেবারে জল-অচল রাজত্ব বিস্তার করে রেখেছে পাঠের উপরে। পাঠকের উপরেও। দেরিদা একেই প্রশ্ন-সংশয়িত করতে চেয়েছেন। দ্বিবাচনিক বিপ্রতীপতার মধ্যবর্তী সীমা-নির্দেশক প্রাচীর ভাঙতে চেয়েছেন তাকে প্রশ্নদীর্ণ করে। তুলে আনতে চেয়েছেন 'Irreconcilable contradictory meaning' বা সাযুজ্য-সম্ভাবনাহীন বিপরীত অর্থের সম্ভাবনা। বাক্‌কেন্দ্রিকতার আধিভৌতিক শাসন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন পাঠ-কে। একে তো 'পুনর্নির্মাণ' বলা চলে না। কারণ পাঠের মধ্যে 'পুনর্নির্মাণ' যদি আর একটা পাঠের সম্ভাবনা নির্মাণ করে, তবে তা হয় সামগ্রিক স্তরে। পাশ্চাত্য সমালোচকের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'Macro Level'। সেখানে ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি থেকে ভাষা ও ভাব যেখানে সমাপতিত হয়, সেই শৈলীর প্রতিটা আনুপুঙ্খ পর্যালোচিত হয় না।

আমরা পূর্বেই বলেছি অবয়ববাদীরা পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা কাঠামো দেখতে পেয়েছিলেন। সাহিত্যের সীমা ছাড়িয়ে তার পরিধি আরও দূর বিস্তৃত। তাঁরা পৃথিবীর সমস্ত জৈব ও অজৈব বস্তুর বিশ্লেষণেই ওই কাঠামোটা সন্ধান ও বোঝার পক্ষপাতী ছিলেন। বিনির্মাণ প্রকৃতপক্ষেই অবয়ববাদকে ছাপিয়ে উঠে উত্তর অবয়ববাদের ভাবনাজাত। ফলে অবয়ববাদীদের কাঠামো সংক্রান্ত ভাবনা যেখানে সীমায়িত হয়েছে, সেখান থেকেই পথ চলা শুরু করেছে উত্তর অবয়ববাদী বিনির্মাণের ভাবনা-চিন্তা। সাহিত্যে পূর্ব-সৃজনের অবয়ব যেখানে বজায় থেকেছে, ভাববস্তু যেখানে পূর্বস্বরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, বিনির্মাণবাদীরা সেই নতুন সৃজনকে বিনির্মাণ বলতে অনিচ্ছুক। তা পুনর্নির্মাণ হতে পারে, বিনির্মাণ নয়। আমরা প্রসঙ্গত এই পুনর্নির্মাণের বিষয়টি কোথায় বিনির্মাণের থেকে আলাদা, তা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আলোচনা করতে পারি। 'বাংলা চার অক্ষর' কাব্যগ্রন্থে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতার নাম 'কুসুমের গল্প'। প্রয়োজনের খাতিরেই গোটা কবিতাটাই এখানে আমরা তুলে দিলাম :

মাদারিহাটের চা-বাগানের কম্পাউন্ডার বাবুর মেয়ে, তার ডাকনাম কুসুম
চেহারা এমন আহা মরি কিছু নয়
বয়সের তুলনায় বড়সড়, নাকটা একটু চাপা
শ্রাবণের মেঘের মতন গায়ের রং

তার চোখ দুটিতে পাহাড়ের লুকোনো ঝর্নার চঞ্চলতা
গান জানে না, কবিতা পড়ে না, শুধু কী করে যেন একটা নাচ শিখেছে
ইস্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশানে ক্লাস টেনের সেই কুসুম
আর দুটি মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে
তালে ভুল করল তিনবার
ফিক করে হেসে ফেলল লজ্জায়
কী আশ্চর্য, তবু উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসা
এই বাগানের মালিকের ছেলের বন্ধু উজ্জ্বল নামে যুবকটি
মুগ্ধ হয়ে গেল তাকে দেখে
নাচ নয়, কুসুমের হাসিটাই বেশি পছন্দ হয়েছিল তার
শুধু কম্পিউটার দক্ষ নয়, সম্প্রতি পিতৃবিয়োগের পর
সে হরিয়ানার একটি কারখানার উত্তরাধিকারী হয়েছে
আপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না, এ যে অভাবনীয় সৌভাগ্য
তিন মাসের মধ্যে বিয়ে, কুসুমকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল
দিল্লির উপান্তে

কলেজে ভর্তি করান হল কুসুমকে, তার উচ্চারণে
বড় বেশি ভুল
নাচ শিখতে পাঠানো হল সোনাল মানসিং-এর কাছে
সোনাল তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তিন সপ্তাহ বাদে
তার পায়ে ছন্দ নেই
দেখতে দেখতে কেটে গেল চার বছর
উজ্জ্বল চলে গেল অন্য বাগানের ফুলের দিকে
তারপর পশ্চিম গোলার্ধের মরীচিকার হাতছানিতে।
হরিয়ানার কারখানার কোয়ার্টারের দোতলায় থাকে কুসুম
এমনি কোনো অসুবিধে নেই, টিভি'র বেলায় কাটে সারাদিন
আর প্রায় সর্বক্ষণ আঙুল চাটে তেঁতুলের আচার
সেইজন্যই সে চিঠি লিখতে পারে না
এক এক রাতে সে উঠে আসে ছাদে
এখানে চা-বাগানের সবুজ ঢেউ নেই

দিগন্তে নেই পাহাড়ের রেখা
শুধু শুকনো ঊষর প্রান্তর, ডাঙা জমি আর কারখানার চিমনি
মাদারিহাট থেকে বোঁটা ছিঁড়ে আনা কুসুম কিছুতেই শুকিয়ে
ঝরে যেতে রাজি নয়
সোনাল মানসিং যাই বলুন, সে এখনো একা একা নাচ
আকাশের নীচে
মাঝে মাঝে একটু আধটু তালভঙ্গ হয় হোক, কেউ তো দেখবে না
স্কুলের ফাংশনে আর যে-দুটি মেয়ে নেচেছিল তারা এখন
কোথায়, কে জানে
তাদের নাম অনসূয়া আর প্রিয়ম্বদা নয়
কিন্তু কুসুমের বাবা-মা শখ করে তার ভালো নাম রেখেছিলেন
শকুন্তলা
নিজের তলপেটে হাত রাখে সে আনমনে
টের পায় একটু একটু নড়াচড়া
আসছে, একজন আসছে, সে খেলা করবে সিংহশিশুর সঙ্গে
এখনো অনেক কিছু ঘটবে!"[১৫]

এখানে পাঠক মাত্রেই ধরতে পারবেন উজ্জ্বল দুষ্মন্তর উত্তরাধিকার, মাদারিহাট আসলে কন্বমুনির আশ্রম, দিল্লি দুষ্মন্তের রাজধানীর একাল সংস্করণ, অনাগত শিশু ভরতের বার্তাবাহী, সর্বোপরি কুসুম শকুন্তলার প্রত্নপ্রতিমা। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'-এর সৃজন কাঠামোটি অবিকৃত রেখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বয়ন করেছেন নতুন শব্দধারা। পূর্ব সৃজনের কোনো বয়ানেরই সুপ্ত অর্থের পুনরুদ্ধার সমাপন হয়নি বর্তমান সৃজনে। উন্মুক্ত হয়নি পূর্ব সৃজনের অন্তর্গত কোনো শাব্দিক বা বাক্যিক অর্থের বহুরৈখিকতা। আকার ও উপস্থাপন বদলালেও পূর্ব অর্থের কাঠামোটি অবিকৃত রয়ে গেছে। তাই এটি পুনর্নির্মাণ। বিনির্মাণ নয়।

দেরিদা পাঠের ক্ষেত্রে পাঠকের ক্ষুদ্রতর বিচারক্ষেত্র, যাকে তিনি 'Micro level reading' বলেছেন, তাকেই প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চেয়েছে। সেটিই 'বিনির্মাণ'। কোনো তত্ত্ব নয়, একটা পাঠরীতি হল এই 'বিনির্মাণ', যার পথে বিছানো থাকে অহরহ প্রশ্ন আর সংশয়। সেটিই পাঠ-কে নিয়ে চলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের কাছাকাছি। আবার এই পদ্ধতিতেই পরক্ষণেই ভেঙে পড়ে পূর্ববর্তী অর্থের সংসার। উন্মুক্ত হয় শব্দ ও বাক্যের, যা টেক্সটের মূল কাঠামো, তার সীমাহীন অর্থগত সম্ভাবনার অর্গল। তার শেষ নেই।

তাই তার সম্বন্ধে শেষ কথা বলা যায় না। শুধু অগ্রসর হয়ে যেতে হয় দ্বিধাহীন হয়ে, সংস্কারহীন হয়ে, শাসনমুক্ত হয়ে।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি বিনির্মাণকে একটা পাঠপ্রক্রিয়া হিসেবে আলোচনার তত্ত্বগত ভিত্তিভূমি ধরে নিয়ে। আসলে তাত্ত্বিক বিচার ও তর্ক সমাধা না হলে আলোচনার পথেই বেশ কিছু সংশয় উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অনেক তাত্ত্বিকই বিনির্মাণ আর পুনর্নির্মাণ নামক বাংলা ভাষায় প্রচলিত পরিভাষার অন্তর্গত অন্তর স্বীকার করতে চান না। সেটার আদৌ কোনো ভিত্তি আছে কিনা, সে তর্কের সমাধান না করে বিনির্মাণকে পাঠগত প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা থেকেই যায়। এই পরিচ্ছেদের মাধ্যমে সেই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আমরা করে দিলাম, এমন দাবি আমরা নিশ্চয়ই করছি না। তবু প্রাসঙ্গিক কিছু তত্ত্বগত প্রশ্নের যেটুকু প্রয়োজনীয় মীমাংসা না করলে এগোনো যায় না, আমরা বর্তমান পরিচ্ছেদে সেটুকু করে নিতে সচেষ্ট হয়েছি। বর্তমান পরিচ্ছেদ বিনির্মাণবাদী পাঠ প্রক্রিয়ার তত্ত্বগত বিচারে মনোনিবেশ করেছে।

তৃ তী য় প রি চ্ছে দ

মনসামঙ্গলের কবি : কাহিনির বিনির্মাণ

ভারতবর্ষের, বিশেষত দাক্ষিণাত্য, উত্তর বিহার, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে নানা কবির মনসামঙ্গলের পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটা কাহিনিগত যোগসূত্র থাকলেও পার্থক্যও চোখে পড়ার মতো। কাহিনি, চরিত্র, পুরাণপ্রসঙ্গের সংযোজন-বিয়োজন, অন্যান্য স্থানীয় প্রচলিত কাহিনির সমাপতন সেগুলিকে বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র দিয়েছে একে অন্যের থেকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনি পাওয়া গেলেও কাহিনিকারের নাম পাওয়া যায়নি। কোথাও আবার মূল কাহিনিকার তথা কবি সমকালে প্রসিদ্ধ অন্য কোনো কবির মধ্যে আড়াল খুঁজেছেন নিজের সৃজনকে জনপ্রিয়তা দেবার জন্যে। কোনো কোনো কবিযশপ্রার্থী দুর্বলকাব্যশক্তির কবি প্রচলিত অন্য কবির ভণিতায় নিজের নাম যুক্ত করে সেই কবি এবং নিজেকে পরবর্তী সাহিত্য পাঠকের কাছে আবিষ্কারের অন্তরায় করে তুলেছেন। তবে একথা স্বীকৃত হলেও প্রসঙ্গত আমরা আরেকবার উচ্চারণ করে নিতে চাই, এমন কোনো আহামরি কবিত্বশক্তির স্রষ্টা এই শ্রেণির মঙ্গলকাব্যে ছিলই না, যাঁকে মুকুন্দ

চক্রবর্তী বা ভারতচন্দ্রের সম-আসনে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাবে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা স্থানভেদে প্রচলিত মনসামঙ্গলের নানা কাহিনির সঙ্গে পরিচিত হব। পরিচিত হব সেই সমস্ত কাব্যলগ্ন নানা কবির সৃজনের সঙ্গে। তবে আলোচনার বিস্তারের কথা মাথায় রেখে আমরা কাব্য ধরে আলোচনার ক্ষেত্রে অবিভক্ত বঙ্গদেশের মধ্যেই আমাদের আলোচনার পরিসর সীমাবদ্ধ রাখব। কবির সৃজনের আলোচনায় আমরা জাড়ি রাখব বিনির্মাণবাদী পাঠরীতি। প্রথমে আমরা মনসামঙ্গলের পরিচিত কাহিনিগুলি আলোচনা করে নিতে চাই। পরিকল্পনা মতোই বর্তমান পরিচ্ছেদ কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকবে।

উত্তর বিহারে প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনি-সংক্ষেপ

সোনাদহে স্নানকালে শিবের জটায় পাঁচটি পদ্মের জন্ম হয়। সেই পাঁচটি পদ্মফুল থেকে কালক্রমে একচক্ষু অন্ধ মনসা ও তাঁর চার কুমারী বোনের আবির্ভাব হল। আবির্ভাবকালেই মনসার সঙ্গে শিবজায়া গৌরীর খণ্ডযুদ্ধ দেখা দিল। মনসার দংশনে গৌরী অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। শিব ধ্যান শেষে দৃশ্য দেখে সমস্ত অনুধাবন করলেন। গৌরীর সংজ্ঞা ফেরানোর নিমিত্তে তিনি মনসাকে স্মরণ করলেন। মনসাও শর্ত দিলেন শিব যদি সম্মত হন পুজো প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শিব-শিষ্য চাঁদ সদাগরকে উৎপীড়ন করতে পারেন। শিব সম্মত হলে মনসা গৌরীর চেতনা ফিরিয়ে দেন। মনসা চাঁদের কাছে পুজো চাইলেন। পরিবর্তে চাঁদ মনসাকে অপমান করে বিতারিত করলেন। কালক্রমে সাপের কামড়ে চাঁদের ছয় ছেলে মারা গেল। চাঁদ তবু মনসা পুজোয় রাজি হলেন না। তার সপ্তম পুত্র লখিন্দর জন্ম নিল। লখিন্দরের বঁড়শীতে একদিন উঠল একটা লোহার মাছ। জলদেবীর পরামর্শক্রমে সেই মাছ হয়ে উঠল লখিন্দরের উপযুক্ত পাত্রী খোঁজার মানদণ্ড। যে ওই মাছটি রন্ধন করতে পারবে সেই হবে লখিন্দরের উপযুক্তা। সাহু সদাগরের গৃহে এসে চাঁদের সন্ধান শেষ হল। সাহু সদাগরের মেয়ে বেহুলা এই অসাধ্য সাধন করে লখিন্দরের পত্নী হল। জাতিস্মর বেহুলার অনুরোধে লৌহবাসর নির্মিত হলেও মনসার নির্দেশে স্থপতি রাখলেন একটি ছিদ্রপথ। সেই পথে মনিয়ার নামক বিষধর সাপ প্রবেশ করল বাসরঘরে। মায়ানিদ্রাচ্ছন্ন বেহুলার চুল ধরে পালঙ্কে উঠে লখিন্দরকে দংশন করল। মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে সমাজের নিষেধ উপেক্ষা করে কলার ভেলায় বেহুলা নির্গত হল প্রাণ ফিরিয়ে আনার অভিযানে।

কালক্রমে সে পৌঁছাল নেতুলার ঘাটে। স্বর্গরজকিনী নেতুলার সাহায্যে স্বর্গে পৌঁছে বেহুলা নাচ-গানের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্ট করলেন। তাঁদের অনুরোধে মনসা

লখিন্দরের প্রাণ ফিরে দিলেন। কিন্তু তাঁর শর্তমতো বেহুলা ফিরে এসে চাঁদকে দিয়ে মনসা পুজো করালেন। মর্ত্যে মনসার পুজো প্রচার পেল।[১৬]

দাক্ষিণাত্যে মনসামঙ্গলের অনুরূপ কাহিনি

দাক্ষিণাত্যে মনসার স্থলে রয়েছেন অম্ববরু নামের ইচ্ছাধারী এক লৌকিক দেবী। সেখানে দেখানো হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব তাঁরই ডিম থেকে জন্ম নিয়েছেন। দেবী তাঁদের বলে দিলেন, তাঁরা যেন অম্ববরু ছাড়া আর কারো পুজো না করেন। ক্রমে দেবী জানলেন তাঁরা নিজেদের পুজো প্রচলন করেছেন। শৃগালে আরোহন করে সর্পসূত্র ধারণ করে দেবী তাঁদের গৃহে গমন করে তাঁদের মেরে ফেললেন। পরে মন্ত্র পড়ে তাঁদের আবার জীবিত করে একমাত্র তাঁরই পুজো করার আদেশ দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু দেবী দেখলেন এক ভক্ত নৃপতি শিব পুজো করছেন। দেবী সেই পুজোয় বিঘ্ন উপস্থিত করলেন ছদ্মবেশে। ধরা পড়ার পর শিব আদেশ দিলেন তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করার। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হল না। দেবী নিজ মূর্তি ধারণ করে নগরবাসীকে তাঁর পুজো করার নির্দেশ দিলেন। নগরবাসীগন স্ত্রী দেবতার পুজো করতে স্বীকৃত হল না। দেবীর প্রকোপে বসন্তরোগে নগর উজার হতে লাগল। শিব মহাজ্ঞান প্রয়োগ করে তাদের আবার বাঁচিয়ে দিতে লাগলেন। অম্ববরু ব্যর্থ হলেন আপন অভিসন্ধিতে। শেষে শিব পুজোর ফুল সংগ্রহ করতে দেবীর পুরিতে ভুলক্রমে প্রবেশ করায় দেবী পূজারিগনকে বন্দী করলেন। শেষে দেবীর পুজোয় শিব ও পূজারিগন সম্মত হওয়ায় দেবী তাঁদের মুক্ত করলেন। এইভাবে দেবীর পুজো প্রচারিত হল।[১৭]

বঙ্গদেশে প্রচারিত মনসামঙ্গলের কাহিনি

চম্পকদেশের বণিক চন্দ্রধর পরমশৈব। মানব রুপে জন্ম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন স্বর্গের শিবপূজারি। শিবপুজোর ফুল সংগ্রহ করতে তিনি একদিন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সাপের আবরণ ও অলঙ্কারে আবৃতা দেবী মনসা সেই অরণ্যে ছিলেন। চাঁদের সাড়া পেয়ে সাপরা স্থান ত্যাগ করলে দেবী চাঁদের সামনে নিরাবরণা হয়ে গেলেন। লজ্জিতা দেবী চাঁদকে অভিশাপ দিলেন মর্ত্যে মানবজন্ম গ্রহণের। চাঁদও জানালেন, যদি এই পরিস্থিতির জন্য চাঁদের কোনো দোষ না থাকে তবে দেবীও চাঁদের ইচ্ছে ভিন্ন মর্ত্যে পুজো পাবেন না। বিজয় সদাগরের গৃহে চাঁদ জন্মগ্রহণ করলেন। বিবাহ হল সনকার সঙ্গে। চাঁদ অনুধাবন করলেন সনকা গোপনে মনসার ঘট পুজো করেন। চাঁদ

পদাঘাতে মনসার ঘট ভেঙে দিলেন। এতে মনসার ক্রোধ হল এবং তিনি চাঁদের গুয়াবাড়ি ধ্বংস করলেন। চম্পকের নর-নারী সাপের কামড়ে মারা যেতে লাগল। চাঁদের বন্ধু শঙ্কর গারুড়ী, যে কিনা নেতার বরদানে অমর ও মহাজ্ঞানের অধিকারী, মন্ত্র পড়ে চাঁদের গুয়াবাড়ি পূর্বাবস্থায় আনলেন। জীবিত করলেন সাপের কামড়ে মারা যাওয়া রাজ্যবাসীকে। বিফলমনোরথ মনসা শঙ্করের মৃত্যুর উপায় তাঁর পত্নীর কাছ থেকে জেনে নিয়ে কৌশলে হত্যা করলেন তাঁকে। অনেকটা রামায়ণের রাবনের মতো চরিত্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এখানে লক্ষ্য করা যায় বঙ্গীয় কবিদলের মধ্যে।

এরপর মনসার প্রকোপে চাঁদের ছয় পুত্র মারা গেল। কৌশলে হরণ করলেন চাঁদের অর্জিত 'মহাজ্ঞান'। মনসা চাঁদের কাছে পুজো প্রার্থনা করলেন। প্রত্যুত্তরে চাঁদ হেঁতালের লাঠি দিয়ে মেরে মনসার কাঁকালি ভেঙে দিলেন। ওদিকে গোপনে মনসার পুজো চালিয়ে যাওয়া সনকা পুনরায় পুত্র সন্তানের বর লাভ করলেন মনসার কাছ থেকে। কিন্তু মনসা শর্ত রাখলেন, চাঁদ যদি মনসা পুজো না করেন, তবে বিবাহের রাত্রেই মারা যাবে এই পুত্র সন্তান। লখিন্দরের জন্ম হল। সনকা ঠিক করলেন পুত্রের বিবাহ দেবেন না। তাহলে মনসার কথা পূরণ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। ইতোমধ্যে চাঁদ সপ্তডিঙা মধুকরে বাণিজ্যযাত্রা করলেন। মনসার অভিশাপে প্রত্যাবর্তনকালে কালিদহে সপ্তডিঙা মধুকর ডুবে গেল। নিমজ্জনকালেও মনসার সন্ধি প্রস্তাব নাকচ করলেন চাঁদ সদাগর। দ্বাদশ বর্ষ ভিক্ষুকের মতো পরিভ্রমণ করে শেষে চম্পক নগরে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন চন্দ্রধর। ফিরেই পুত্র লখিন্দরের বিবাহের আয়োজন করতে শুরু করলেন চাঁদ। কার্যক্ষেত্রে লখিন্দরের বিবাহদান থেকে চাঁদকে সনকা নিবৃত্ত করতে পারলেন না। ঠিক হল নিশ্ছিদ্র লৌহ বাসরঘরে হবে লখিন্দরের বাসর। কিন্তু মনসার ষড়যন্ত্রে বাসরঘর নিশ্ছিদ্র থাকল না। পরিণতিতে সেখানেই সর্প-দংশনে মৃত্যু হল লখিন্দরের। কলার মান্দাসে বেহুলা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্গত হলেন গাঙুরের পথে। গোদার ঘাটে উপনীত হলে গোদা বেহুলাকে রূপমুগ্ধ হয়ে বিবাহ করতে চাইলেন। বেহুলা তাঁকে অভিশাপ দিলেন প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত গোদার পায়ে বঁড়শী ঢুকে থাকবে। মান্দাস ক্রমে আপু ডমের ঘাটে আসল। সেও অনুরূপ বাসনা জানালে বেহুলার অহিশাপে অচেতন হয়ে নদীঘাটে পড়ে রইল। ক্রমে বাহুলা জালু-মালু, ধোনা-মোনার ঘাটও এই ভাবে পার হয়ে গেলে। নেতা ধোপানীর ঘাট থেকে বেহুলা পেল স্বর্গে যাওয়ার ঠিকানা। নৃত্য-গীতে শিব সহ তেত্রিশকোটি দেবতা কে তুষ্ট করল বেহুলা। বেহুলার ইচ্ছে মতো শিব মনসাকে আদেশ দিলেন লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য। মনসা লখিন্দর সহ তার অন্য

ভাইদেরও প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু শর্ত দিলেন চাঁদ মনসা পুজো করলে তবেই লখিন্দরের প্রাণ ধারণ নিশ্চিত হবে। সপ্তডিঙা মধুকরে ছয় দেবর সহ লখিন্দরকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল বেহুলা। তার অনুরোধে নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রেখে পিছন ফিরে বাম হাতে ফুল ফেলে চাঁদ মনসা পুজো করলেন। মনসার পুজো মর্ত্যে প্রচারিত হল।[১৮]

উপরের কাহিনিগুলো পর্যালোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারছি বঙ্গদেশে প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনিটি বেশি দীর্ঘ ও বহুকৌণিক। অনেক সমকালীন ও পুরাণাশ্রিত কাহিনি এর মধ্যে সমাপতিত হয়ে কাহিনিটিকে জটিলতা দিয়েছে। শঙ্কর গারুড়ী বা নেত্রবতীর কাহিনি বা জালু-মালু বা গোদার কাহিনি হয়ত সমকালে প্রচলিত ভিন্ন কাহিনি। কারণ মূল কাহিনিতে এদের সন্নিবেশ না করলেও কাহিনির গতিতে খুব একটা ক্ষতি হত না। মূল কাহিনির সঙ্গে এই কাহিনিগুলোর আমন কিছু যোগ নেই। অবশ্য বিহারি কাহিনিতেও একজন নেতুলার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তুলনায় বিহারি ও দক্ষিণের কাহিনি অনেক সরল। আমাদের মনে হয় মূল কাহিনিটি এই রকম সরলই ছিল। বঙ্গকবিরা আপন কল্পনায় তাকে জটিল ও বহুকৌণিক করেছেন। তবে বঙ্গদেশের কবিদের রচনায় বিহারি ও দাক্ষিণাত্যের এই লৌকিক দেবীর কাহিনি নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এখন আমরা এই কাহিনিগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যগুলির প্রধান প্রধান কবি ধরে বিনির্মাণবাদী পাঠ করব। বিনির্মাণবাদ এক্ষেত্রে দর্শন হিসেবে নয়, পাঠের উপকরণ হিসেবে ধরে পাঠ করব। দেরিদা সবসময় পাঠের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত (Privileged) অর্থের অধিতল ভাঙার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে অনাদি কাল থেকে অর্থের জগতে এই অধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত অর্থের সঙ্গে একটা পক্ষপাতমূলক আচরণ পাঠের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম হয়ে আসছে। যেমন অন্ধকারের উপর আলোর গুরুত্ব, খারাপের উপর ভালোর গুরুত্ব, মানুষের উপর দেবতার গুরুত্ব, যৌনতার উপর প্রেমের গুরুত্ব, অশ্লীলতার উপর শ্লীলতার গুরুত্ব, ব্যক্তির উপর গোষ্ঠীর গুরুত্ব ইত্যাদি। এই পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি অস্বীকার করতে পারলেই আমরা পাঠের এমন এমন অনাবিষ্কৃত অর্থের সমীপবর্তী হতে পারি যা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যকে সাকার ও সম্ভবপর করে তোলে। আমরা সেই পক্ষপাতহীন পাঠেই মনোনিবেশ করতে চলেছি।

মনসামঙ্গলের বিনির্মিত পাঠ : প্রসঙ্গ বিপ্রদাস পিপিলাই

বিপ্রদাস পিপিলাই পশ্চিমবঙ্গীয় কবি। পুথিতে তিনি আবাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'বাদুড়্যা বটগ্রাম'-এর। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'

রচনা করতে গিয়ে এই নামের কোনো গ্রামের সন্ধান পাননি। অপরদিকে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস তাঁর 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল' গ্রন্থে বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়াকেই কবির জন্মস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। সে বিতর্ক বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, কবি পশ্চিমবঙ্গের। পাঠের ক্ষেত্রে আমাদের এইটুকু তথ্যই প্রয়োজন। এতাবৎ কবির পুথির চারটি অনুলিখন পাওয়া গেছে। সেই চারটি পাঠ মিলিয়ে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস যে সর্বশেষ পাঠটি নির্মাণ করেছেন, বিনির্মাণবাদী পাঠের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকেই অনুসরণ করেছি। অন্য কোনো পাঠ গ্রহণ করলেও অসুবিধা ছিল না। আমাদের এই পাঠ-প্রচেষ্টা পুথির যাথার্থ্য সন্ধানের জন্য নয়। আমরা কেবল কবির নামে প্রচারিত একটি পাঠের ভিতরে অনুক্ত অর্থের বহুরৈখিকতা উদ্ধারে ব্রতী হয়েছি। তাই সেক্ষেত্রে কার সম্পাদিত পুথিকে আমরা অনুসরণ করছি, সেটা বড় কথা নয়। একটা সমালোচক ও পাঠক মহলে মান্যতা পাওয়া পুথিকে অবলম্বন করলেই এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায়। আমরা সেটাই করেছি।

আমরা মনসামঙ্গলের মতো প্রাচীন কাব্যের পঙক্তিগুলি পাঠ করছি। কিন্তু সেই পাঠ করছি উত্তরবিশ্বযুদ্ধকালের একটি পাঠ প্রক্রিয়ায়। ফলে প্রথমেই আমাদের স্মরণে রাখতে হয়েছে সময়ের ব্যবধানের কথা। অষ্টাদশ শতকের আগে বাংলার সমাজ ও পরিবেশে বাঙালি কবি ও বাঙালি পাঠক-শ্রোতার মর্জি এবং ধারণ ক্ষমতার কথা পর্যালোচনা না করলে নানারকম সমস্যা আমাদের পাঠে দেখা দিতে পারে। কাহিনিতে কী কী বিষয় সন্নিবিষ্ট করলে তা শ্রোতামোহিনী হবে তা যেমন সেকালের কবি, অনুলিখনকারী বা বায়েনদের মাথায় রাখতে হয়েছে, তেমনি আমাদেরও চিন্তনে রাখতে হয়েছে। আমাদের বিচারে এও রাখতে হয়েছে ঠিক কী কী কথা কবিরা তাঁদের পদসমূহে রাখতে পারতেন, অথচ রাখেননি। আমরা জানি শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর যতই যুক্তিসঙ্গত কারণ লিখে জয়ানন্দ একালের সাধারণ পাঠকের বাহবা আদায় করুন না কেন, কবি সুখ্যাতির ক্ষেত্রে তা কিন্তু উল্টো ফল প্রদান করেছিল। শুধু তাই না, তিনি চিরকাল বৈষ্ণব সাধক ও পাঠক মহলে ব্রাত্যই থেকে গেছেন। এমন পরিণতি বেশিরভাগ কবিই চাননি। ফলে সমকালের টেম্পারামেন্টের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তাঁরা লিখেছেন। আমরা একথাও হলপ করে বলতে পারি না, আমরা যে অর্থের বহুরৈখিকতা সন্ধান করছি, তার কোনোটা বা প্রত্যেকটা কবি কালের চাপে প্রকাশ করতে পারেননি। এমন কোনো অর্থ তাঁদের চিন্তাতেই ছিল না, হতেই পারে। কিন্তু বিনির্মাণের উদ্দেশ্য বিষয় বা বিষয়ীকেন্দ্রিক কোনো ভাবেই নয়। ফলে তাঁরা কী

চেয়েছিলেন, বা কী চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি, তা আমাদের বিচার্য নয়। আমরা কেবল সুপ্ত অর্থের সম্ভাবনাগুলোকে উন্মুক্ত করে করে যাচ্ছি আমাদের এই যাত্রাপথে।

প্রত্যেক মনসামঙ্গলেই দেবখণ্ড নামক অধ্যায় বর্তমান। সেখানে শুধু মনসা নন, আনুষঙ্গিক অনেক দেব-দেবীর কাহিনি বর্ণনা করার রীতি ছিল। কেন এই রীতি, সে প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করলে বহুবিধ সম্ভাবনা সামনে আসে। প্রথমত, মনসার বৈদিক মাহাত্ম্য খুব ক্ষীণ। মহাভারতের কাল পর্যন্ত দেবীর তেমন উল্লেখ নেই। মহাভারতে বাসুকির উল্লেখ আছে নাগরাজ হিসেবে। তাঁর সহোদরা জরৎকারু আস্তিকের আগামী মা হিসেবেই কেবল উল্লেখের মধ্যে ছিলেন। লক্ষণীয় জরৎকারু মহাভারতে মুনি বা পুরুষ নন। আস্তিকের মা, অর্থাৎ নারী। সর্পসত্র যজ্ঞ নিবারণ করে সর্পবংশ রক্ষায় আস্তিকের যে তাৎপর্য, জরৎকারু সেখানে কেবল সলতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কোনো মহিলা নাগ বা নাগদেবীকে মহাভারতোত্তর অর্বাচীন পুরাণগুলি রচনার আগে তেমন বৈদিক স্বীকৃতি লাভ করতে আমরা দেখিনি। ফলে মঙ্গলকাব্যের কবিদের মনসার একটা পৌরাণিক সত্তা প্রতিপাদনের দরকার ছিল। সেটা তাঁরা করেছেন এই দেবখণ্ডে। দ্বিতীয়ত, দেবখণ্ডের সৌজন্যে এমন অনেক ঘটনা তাঁরা উল্লেখ করেছেন, যা সমকালীন মানবসমাজেই প্রশাসক বা উচ্চবিত্ত ও বর্ণের (দেবোপম?) মধ্যে ঘটত। কিন্তু মানবখণ্ডে তাকে প্রকাশ করলে উদ্দিষ্ট ক্ষমতাবানেরা কবির ইহজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারতেন। দেবতাদের উপর ঘটনাগুলি আরোপ করে কাদা না মেখে মাছ ধরার কাজটা তাঁরা করে থাকতে পারেন। চণ্ডীমঙ্গলে 'পশুগনের ক্রন্দন'-এ 'পশুগন' কারা, তা আমাদের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সেই কারণে আমরা দেবখণ্ডের পদগুলিতে শব্দের নানামুখী অর্থের অধিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করে থাকি।

মনসার জন্ম নিয়ে বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর মনসামঙ্গলের প্রথম পালাতেই উল্লেখ করছেন :

জনম পাতালপুরী অযোনিসম্ভবা।
নির্মাণি জননী মহাদেব তেজস ভবা।।
আপনা-আপনি কৈলা জীবের সঞ্চার।
বাসুকি দিলেন বিষ নাগ-অধিকার।।
উদ্ভবা পাতাল নাম পাতালকুমারী।
নাগ দান পাইয়া নাম হৈল নাগেশ্বরী।।[১৯]

আমাদের প্রথমেই নজর দিতে হবে 'অযোনিসম্ভবা' শব্দটিতে। দেবমহিমার খাতিরে বিষয়টি মধ্যযুগে এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু 'তেজস ভবা' শিবের

লৌকিক চরিত্রকে বিচারে আনলে শব্দটির মধ্যের একটা পরিচয়হীনতার আক্ষেপ লুকিয়ে থাকে। 'অযোনিসম্ভব' আদতেই যেহেতু সম্ভব নয়, সেহেতু মনসার মাতা রূপে আমাদের কবি 'নির্মাণি'-কে (অর্থাৎ অজ্ঞাত বা পরিচয় দানের পক্ষে বিপজ্জনক স্ত্রী-গর্ভ, যেখানে নির্মাণ হয়) উপহার দিলেন। 'পাতালপুরী'ও আমাদের কাছে অজ্ঞেয় রহস্যের জারক, যাকে অন্ধকারের কানুন এমন ভাবে ঢেকে রাখে যে, প্রকাশ্যের জ্যোতি তাকে বিচারের কাঠগড়ায় পায় না। পাতালে এই মনসার উদ্ভবের বিষয়টা পরবর্তী সাহিত্যও গ্রহণ করেছে। শম্ভু মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'চাঁদবণিকের পালা'-তে বারবার উল্লেখিত হয়েছে মনসার এই পাতাললগ্নতা। সম্ভবত এই পাতালপুরীর যোগ মনসার বিষ-স্বভাবকে আরও বিষাক্ত করেছে। সাপের বাসস্থান হিসেবে গর্তের বিষয়টি সেই অজ্ঞেয়তাকে মান্যতা দিয়েছে।

প্রথম পালাতেই বিপ্রদাস দেবী মনসার পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে এমন কিছু অভিধা উচ্চারণ করেছেন, যা আমদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন কবি লিখছেন :

চণ্ডীর বিবাদে নাম হৈল নির্বাসিনী।
পর্বতে পার্বতী নাম পর্বতবাসিনী।।
জরৎকার-পত্নী নাম হৈল জগৎগৌরী।
পতির বিচ্ছেদে নাম পতি মন্দোদরী।।
জাগিয়া জাগুলী নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।
আমি কি বলিতে পারি আমার শকতি।।[২০]

আমরা 'পার্বতী' নামে শিবজায়াকেই চিনি। কিন্তু এখানে কবি মনসাকে 'পার্বতী' নামে উল্লেখ করছেন। এর কারণ কী হতে পারে? আমাদের মনে এর অনেকগুলি অর্থগত সম্ভাবনার উদয় হয়। প্রথমত, 'পার্বতী' নামের যে পৌরাণিক স্বীকৃতি আছে, তার মধ্যে মনসাকে স্থিত করতে পারলে মনসার মহিমা বিস্তার, যা মূলত কবির উদ্দেশ্য, তা সিদ্ধ হওয়ার পথ সহজতর হয়। দ্বিতীয়ত, মনসা ও চণ্ডীর সতীন-কোন্দলের কথা মাথায় রাখলে চণ্ডী ও মনসার মধ্যে একটা অভেদ কল্পনা করা যেতেই পারে। সেই অভেদ মূলত পুরুষের অধিকার অথবা পুরুষের পাশের স্থানটি হারাবার ভয় হিসেবে যদি আমরা বর্ণনা করি, তাহলে যুক্তির অপলাপ হবে কি! এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিরাপত্তার প্রশ্ন, সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। তৃতীয়ত, পর্বত-অধিশ্বরের কাছে 'পার্বতী' তো উভয়েই। বিশেষত প্রায় প্রতিটি মনসামঙ্গলেই দেখেছি মনসাকে প্রথম দর্শনে শিব ভোগই করতে চেয়েছেন। 'পার্বতী'

তারা দেহে। দেহের ভঙ্গিমায়। প্রকৃতির উন্নয়ন-অবনয়নের রেখাচিত্রে। 'জগৎগৌরী' অভিধার মধ্যেও একই প্রচেষ্টা কার্যকর ছিল বলা যেতে পারে। একে কেবল চৌতিশার অনুবন্ধ ভাবতে নারাজ আমরা।

'সিজবৃক্ষ' মনসার সঙ্গে বারবার উল্লেখিত হতে দেখেছি। মালদহের পাণ্ডুয়ায় প্রাপ্ত মনসার ব্রোঞ্জমূর্তি (আনু: ১১শ শতক) বা দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে প্রাপ্ত মনসার প্রস্তরমূর্তির (আনু: ১১শ শতক) মধ্যে এই সিজবৃক্ষের উপস্থিতি দেখতে পাই। অনেক স্থানেই এই বৃক্ষ 'ফণীমনসা' নামেও পরিচিত। সর্পিল কন্টকময় এই গাছ নানা কারণেই মনসার মিথে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু মনসার সঙ্গে কবি বিপ্রদাস 'সিজুয়া' পর্বতকেও সন্নিবিষ্ট করেছেন ('নির্বাসিলা সিজুয়া পর্বতে', তদেব পৃ.২৫৬)। লৌকিক মনসাকে আমরা সন্তানহীনের সন্তান সম্ভাবনা বা কৃষি ও উৎপাদনশীলতার সঙ্গে বারবার সংযুক্ত করতে দেখেছি। মনসা-সংস্কৃতির যেখানে যে আচরণ আজও প্রচলিত আছে, সে-সকল স্থানেই দেখতে পাই এই সৃজন তথা উৎপাদনশীলতার সঙ্গে লোকজীবনে দেবীকে যুক্ত করা হয়েছে। 'সিজ' বা 'সিজুয়া' সম্ভত সেই সৃজনশীলতারই নির্দেশক।

এর পরে আমরা আসতে পারি মনসামঙ্গলের 'ডোমনী' প্রসঙ্গে। দেবখণ্ড থেকে মানবখণ্ডে এই 'ডোমনী' প্রসঙ্গ বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। কেবল বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে নয়, প্রায় প্রত্যেক মনসামঙ্গলেই এই 'ডোমনী' প্রসঙ্গের উল্লেখ পাই। চণ্ডীমঙ্গল থেকে শেষ উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য অন্নদামঙ্গলেও এসেছে এই ডোমনী প্রসঙ্গ। একথা বলতে আমাদের খুব বেশি তথ্যব্যয় করতে হয় না যে এই 'ডোমনী' বা 'ডুমনী' আসলে চর্যার কালের 'ডোম্বী' বা 'ডোম্বি'-র উত্তরাধিকার। সমাজের অন্ত্যজ ও আর্থিকভাবে অবহেলিত তলার বাসিন্দা নারী।

এই ডোম নারী নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় শম্ভু মিত্রের 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের নেতা ধোপানী চরিত্রটির একটি শ্লেষ। সে বলেছিল সে রজকিনী। সমাজের অপরতলার ঘাম মুছিয়ে তার দিন কাটে। কথাটি নিঃসন্দেহে ইঙ্গিতময়। সে যদিও ডোম নয়। তবু একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না ডোম নারীকেও সমাজের ওপরতলা সুযোগ মতো 'ঘাম' মোছানোর কাজে লাগিয়ে থাকতেন। ডোম নারী এমন এক সামাজিক তলে অবস্থান করছেন, যেখানে তিনি লাঞ্ছিতা হলে অভিযোগ জানাবার জায়গা নেই। কারণ সেক্ষেত্রে বিচারককেই অভিযুক্তের স্থানে বসতে হয়। ফলত তিনি সহজলভ্য। তাকে যেকোনো কাজের আবদার বা হুকুম করা যায়। তা সে যতই অবমাননাকর হোক না কেন। সামাজিক ব্যভিচারের শিকার এই

নারীদের কথাই 'ডোম্বী', 'ডোমনী' বা 'ডুমনী'দের প্রসঙ্গে বারবার অনুক্ত অর্থ নিয়ে একালের পাঠকের দৃষ্টি প্রত্যাশায় হাজির হয়। বিপ্রদাস ১৩ সংখ্যক গানে নদী পারে ইচ্ছুক শিবের ডোমনী বেশে থাকা গৌরীকে দেখে যে অবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনায় লিখছেন :

কতদূরে গিয়া ধরি ডমনীর হাতে।
আলিঙ্গন দেহ রামা কহে ভূতনাথে।।
আমি শূলপানি তোরে বিনয় আমার।
ভজিয়া আমারে কর কামসিন্ধু পার।।[২১]

ডোম নারীর দুর্গতির পাশাপাশি এখানে 'শূলপানি' শব্দটিও লক্ষণীয়। 'কামসিন্ধু' পারে ইচ্ছুক শিব কিন্তু নিজের ১০৮ নামের মধ্যে এই বিশেষ নামটি ব্যবহার করছেন মাঝনদীতে এক অন্ত্যজ নারীর স্বাধিকার হরণের নিমিত্তে। 'পানি' কর্মেন্দ্রিয়। অর্থাৎ বংশমর্যাদার থেকে এখানে পদমর্যাদা বা শক্তির বা শস্ত্রশক্তির বিষয়টা গুরুত্ব পাচ্ছে। পদাধিকার বা শস্ত্রশক্তির কাছে 'বিনয়'-এর আবদার নিঃসন্দেহে একটা আদেশেরই নামান্তর। তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা অন্তত একজন ডোমনীর থাকা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে এই চারিত্র্য শিথিলতা একটা বর্ণসংকর শ্রেণির উদ্ভবের ইতিহাসও নীরবে উচ্চারিত হয়ে যায়। যাক সেসব কথা, আমরা আবার ডোমনী প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মানবখণ্ডের উপান্তে আমরা বেহুলাকেও ডোমনী বেশ ধারণ করতে দেখেছি। মালদহের জনজাতিদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানে 'ডুমনি কাচ' (ডোমের বেশ ধারণ করে নাচ) প্রথার প্রচলন দেখেছেন অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস (তদেব, পৃ. ১৭৫)। অনার্য অন্ত্যজ শ্রেণির অব্যক্ত গুরুত্ব সম্ভবত মনসামঙ্গলে এইভাবেই ছড়িয়ে আছে পাঠের অভ্যন্তরে। মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই বর্ণউচ্চ সমাজের প্রতিনিধি। তবু তাঁরা সামাজিক সত্যের কাছে হার মেনেছেন। প্রকট ভাবে না হলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্ত্যজদের সামাজিক বাধ্যবাধকতাকে তুলে রেখেছেন নিজেদের সৃজনে।

প্রসঙ্গত বিপ্রদাসের কাব্যের একটি অংশ আমরা উদ্ধার করতে চাই, যেখানে 'সতীত্ব' নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি ধুলোয় মিশে যায়। বৃদ্ধ 'কুশলি' বেশে চণ্ডীর সঙ্গে রতিক্রিয়া শেষে স্বমূর্তি ধারণ করে শিব চণ্ডীকে তিরস্কার করছেন :

আমি ভণ্ড তপস্বী তুমি ত বড় সতী।
বৃদ্ধ কুশলি লইয়া বঞ্চ রঙ্গরতি।।[২২]

চণ্ডী যেখানে আর এক রূপে 'সতী' এবং সতীত্বের পরাকাষ্ঠা, সেখানে মহাদেবের 'সতী' স্থানকেই আক্রমণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কী এই সতীত্ব! কাকে বলে সতী!

কীভাবে সতীত্ব রক্ষা করা যায়, বা কিসের জন্য সতীত্ব রক্ষা করা জরুরী! সতীত্ব কোনো প্রত্যঙ্গে জড়িত বিষয় নয়। হলে বিবাহিত নারীর সতীত্বের প্রশ্ন আসে না। সতীত্ব আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের মানসিক শান্তির জন্য পুরুষেরই তৈরি নারীর আচরণীয় কর্তব্য। সে কর্তব্য নারীর বিশেষ কাজের না। তবু নারীকেই তার তল্পী বহন করে নিয়ে যেতে হয়। পুরুষ তার স্রষ্টা, পুরুষ তার বিধাতা, পুরুষই তার হন্তা। ডোম নারীর সতীত্ব হননের পরে নিজ নারীর সতীত্ব লুণ্ঠন শেষে শিবকে দিয়ে কবি কি এই বার্তাই সংগোপনে ছড়িয়ে দিলেন যে, সতীত্ব কেবল একটা মীথ এবং তার অস্তিত্ব কেবল সুযোগের অপ্রাপ্তিতে!

মনসা জন্মের যে বৃত্তান্ত কবি বিপ্রদাস লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখান থেকে 'আযোনিসম্ভুতা' মনসার মাতৃপরিচয়ের সন্ধান করতে পারি আমরা। কবি লিখছেন :

অতিশয় কাম ভোলে শঙ্করের চন্দ্র টলে
করেতে ধরিল দেবনাথে।
দুঃখমনে পঞ্চানন ভাবিয়াত নিরঞ্জন
এড়িল বিচিত্র পদ্মপাতে।।...
পদ্মপাত্রে হর-চন্দ্র হইল সুস্থির।
অম্বু ভেদিয়া পড়ে বাসুকির শির।।...
জ্যতির্ময় দীপ্ত করে দেখিল নির্মাণি।
ধেয়ানে জানিল চন্দ্র এড়িল শূলপানি।।[২৩]

শিথিল ধাতুর শিবকে উচ্চকটির পুরুষ ধরতে যদি আমাদের কোনো অসুবিধা না থাকে, বিশেষত মধ্যযুগেও যেখানে তেমন কোনো বিরোধের আভাস পাইনি, সেখানে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে বাধ্য 'পদ্মপাতে' বা 'নির্মাণি' শব্দগুলির প্রতি। এগুলির মধ্যে মনসার এক অকথিত জন্মরহস্য আমরা উদ্ধার করতে পারি। যে 'পদ্মপাতে' শিব 'এড়িল' এবং সংশয়মুক্ত হলেন সে 'পদ্মপাত'-কে পরিচয়হীন (অন্ত্যেবাসী বা পাতালনিবাসী বা অন্ত্যজ নারী, নির্মাণিও হতে পারেন) বাৎস্যায়ন কথিত 'পদ্মযোনি' নারীর সঙ্গে অভেদ কল্পনা করলে কি কষ্টকল্পনার নামান্তর হবে! আমাদের তা মনে হয় না। বিশেষত তার পরেই দেখতে পাচ্ছি নির্মাণি পরপুরুষের সন্তানকে আপন করে নিয়ে তাকে পুত্র বাসুকির ভগিনির পরিচয়ে অভিষিক্ত করেছেন। মহাভারতে এভাবেই পঞ্চপাণ্ডব কুন্তির কাছে মাতৃপরিচয় এবং পাণ্ডুর কাছে পিতৃপরিচয় লাভ করেছেন, যদিও তাঁরা কেউই পাণ্ডুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেননি। এঁরা সকলেই ছিলেন ক্ষেত্রজ সন্তান। মনসাও ক্ষেত্রজ সন্তান। ক্ষেত্রজ সন্তান লালনের উদারতা ও ইতিহাস দুটোই

ভারতবর্ষে প্রাচীন। অন্যান্য মনসামঙ্গলকাব্যগুলি বিচার করেও দেখেছি আমরা। সেখানেও মনসার এই ক্ষেত্রজ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক প্রতিভাত হয়েছে আমাদের। মনসামঙ্গল হল মনসার ক্ষেত্রজ পরিচয়ের সীমা ছাড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। বহুলাংশে জাবাল সত্যকামের ছাপ রয়েছে তার কাহিনিতে। ঠিক এভাবেই বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি বিশ্লেষণ করলে অনাবিষ্কৃত অর্থের নতুন নতুন সম্ভাবনা আমরা ছুঁতে পারি। সমস্ত কাব্য এমনই অনুক্ত অর্থের বহুরৈখিকতায় বিনির্মিত হয়ার সম্ভাবনা রাখে।

মনসামঙ্গলের বিনির্মিত পাঠ : প্রসঙ্গ বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের পাঠগত বিনির্মাণ ঘটানোর জন্য আমরা অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত 'বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল' গ্রন্থটি গ্রহণ করেছি। কেন এই সম্পাদনাটি গ্রহণ করলাম আমরা, তার যুক্তি আমরা বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল পর্যালোচনাকালেই উল্লেখ করেছি। একই যুক্তির পুনরুল্লেখ করা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল এই ধারায় সর্বাধিক প্রচারিত ও জনপ্রিয় সৃজনগুলির মধ্যে অন্যতম। ফতেয়াবাদ মুলুকের ফুল্লশ্রী গ্রামের কবিকে আমরা পূর্ববঙ্গের মনসা-পালাকারদের প্রতিনিধি ধরতে পারি। পুর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে কবির সৃজনের যথেষ্ঠ প্রচার ও জনপ্রিয়তা ছিল। তবে সে সৃজনে যশোহর-খুলনা-ফরিদপুরের ভাষিক নমুনা কবিকে পূর্ববঙ্গের কবি হিসেবেই প্রতিষ্ঠা দেয়।

যেহেতু কবির মঙ্গলগান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, সেহেতু কবির মূল সৃজনের উপর গায়েন-বায়েন ও অনুলিপিকরদের কলমও চলেছে বেশি। এপর্যন্ত কবির ২১টি পালায় ৩০১টি গান এবং ন্যূনাধিক ৫৫৮২টি মিত্রাক্ষর পয়ার বা ত্রিপদী পাওয়া গেছে বলে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস উল্লেখ করেছেন [বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা:), ২০০৯, 'বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল', কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, পৃ. ৯]। একইসঙ্গে যেহেতু প্রচুর প্রক্ষেপ ঘটায় কবির কোনো পুথিই তেমন পুরাতন নয়। বারবার প্রক্ষেপ ঘটতে ঘটতে কাব্যের ভাষাও হয়ে গেছে অনেকটা আধুনিক। একাধিক কবি, বায়ে-গায়েন ও অনুলিপিকরদের ভণিতাও সংযুক্ত হয়েছে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে। তবে কাব্যের বয়নের দিক থেকে ধরলে মনসামঙ্গলের সবথেকে বড় কবি হিসেবে বিজয় গুপ্তকে ধরাই যায়। কবি বিপ্রদাসের মতোই বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের দেবখণ্ড পর্যালোচনায় আমরা মনোনিবেশ করলে এমন অনেক অর্থ বোধের সামনে আমাদের

দাঁড়াতে হয় যা, একই সঙ্গে অস্বস্তিকর ও নতুন চিন্তার উদ্রেককারী। মনসার জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করতে গিয়ে কবি ত্রিপদীতে লিখছেন :

কে বুঝে দৈবের গতি যে দেব সৃষ্টির পতি
হেন শিব পীড়িত মদনে।।
কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব
রতি রসে করে টসমস।
অতি কামে হইয়া ভোল শ্রীফলবৃক্ষেরে দিল কোল
আচম্বিতে খসিল মহারস।
খসিল অক্ষয় ধন চমকিত ত্রিলোচন
বামহস্তে ধরিল সন্ধানে।
চন্দ্র হাতে মনে করি সঙ্গে না আনিলাম গৌরী
এ অগ্নি ধরিবে কোন জনে।।
শঙ্কায় বিকল মন নেহারে কমল বন
চিন্তাতে হৃদয় অসুস্থ।
সম্ভ্রমে নামিয়া জলে এড়িল কমল দলে
সরোবরে পাখালিল হস্ত।।[২৪]

পঙক্তিগুলিতে এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ কবি করলেন, যা আমাদের নতুন অর্থের সন্ধানে প্রবুদ্ধ করে। 'অতি কামে হইয়া ভোল' শিব কেন 'শ্রীফলবৃক্ষেরে' অর্থাৎ বেলগাছকে 'কোল' দিলেন! মহাভারতে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মবৃত্তান্তে আমরা মনুষ্যেতর প্রাণীর গর্ভে সংকর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা শুনেছি। মৎস্য, গাভি, গধিকা, পক্ষীকামের নানা দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাচ্যপুরাণ ও ভাস্কর্যে রয়েছে। 'ইতু' ('ঋতু' থেকে এসেছে! কারণ এখানে ঋতুনিয়ন্ত্রক সূর্যের নামেই ব্রত পালন করা হয়) ব্রতে উংনো-ঝুংনের কাহিনিতে বৃক্ষগর্ভে মানবীর অবস্থানের কথা আমরা শুনেছি। বিজয় গুপ্ত কি তেমনই এক ব্যতিক্রমী কামাচারের নিদর্শন রাখলেন না! দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে 'কমল দলে' রেতস্থাপনের কথা কবি উল্লেখ করছেন, তার অনুরূপ কাহিনি আমরা বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে পেয়েছি এবং ব্যাখ্যাও করেছি। বিজয় গুপ্তের মনসার সঙ্গেও সেই কৃষি কাল্টের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জন্মকালেই একটি মাত্র শব্দের প্রয়োগে :

উপজিল বিষহরী আনন্দিত সুরপুরী
প্রসন্ন হইল বসুমতী।।[২৫]

বসুমতীর প্রসন্নতা আর সুরপুরের আনন্দ একই সঙ্গে আমাদের সামাজিক উচ্চ ও অধোতলের মিলনের অনুক্ত বার্তাও দিয়ে যায়।

শব্দ চয়নে চণ্ডী ও মনসার অভেদ প্রকল্প বিজয় গুপ্তের প্রচেষ্টাতেও ছিল অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিদের মতোই। কেন ছিল সে ব্যাখ্যা বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল পাঠকালেই আমরা আলোচনা করেছি। এখন বিজয় গুপ্তের কাব্যে অনুরূপ পঙক্তিমধ্যস্থ শব্দ উদ্ধার করছি :

এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা আনন্দিত মন।
ব্রহ্মা আসি করেন মায়ের নামকরণ।।
বিষমুখ দেখিয়া মায়ের নাম বিষহরি।
জগতের হিতকারী নাম জগৎগৌরী।।[২৬]

নিজের পূজা প্রাপ্তির নিমিত্তে মনসাকৃত অহিতের অন্ত ছিল না। তবু এই নামকরণের মধ্যে একটা শিষ্ট জগদ্ধাত্রী বা জগৎগৌরী রূপে মনসাকে প্রতিষ্ঠা আসলে বৈদিক ঊর্বা দানের চেষ্টা। নিঃসন্দেহে মনসা হলেন পুরুষের সীমাহীন এবং সংযমহীন কামনার মানস শরীর। তাকে উচ্চকটিতে স্থান দিতে হলে এই আন্তরিক প্রচেষ্টার দরকার ছিল। শব্দ চয়ন ছাড়া সে প্রচেষ্টা সাকার করার সম্ভাবনা ছিল না।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের 'লখিন্দর দংশন পালা'য় এমন একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যাকে বিশ্লেষণ করলে সমগ্র মনসামঙ্গলের অভিমুখ বদলে যেতে পারে। দেবী মাহাত্ম্য প্রচারের কাব্য থেকে এই কাব্য প্রবলভাবে সমাজবাস্তবতার কাব্য হিসেবে পঠিত হওয়ার দাবিদার হয়ে উঠতে পারে এই কাব্য ওই একটি শব্দের সৌজন্যে। আমরা লখিন্দরকে সর্পদষ্ট করার পরবর্তী প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে উদ্ধার করলাম :

চান্দ বলে শুন সোনা কার্যে কর তাড়া।
জ্ঞাতিগনে হাসিবে ঘরে বাসি মড়া।।
সকল পদ্মকাষ্ঠ নাও চন্দন আগর।
গাঙ্গুড়ীর কূলে নিয়া পোড় লক্ষীন্দর।।
বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাস কর আছে কি সাহস।
লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ।।
শ্বশুরের কথা বেহুলার প্রাণে লাগে ভয়।
হস্তযোড় করিয়া শ্বশুরের আগে কয়।।
পাপ কর্মের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী।
কাল হইল বিয়া আজ হইলাম রান্ডী।।

মায় দিল বরণশয্যা বরিবার তরে।
প্রাণনাথ ঢলিয়াছে বরিব কাহারে।।
সিঁথির সিন্দুরে আমার না পড়িল কালি।
কাঁচা রাড়ি বলে মোরে কেবা দিল গালি।।
বেহুলা বলে শ্বশুর তুমি দেবতা সমান।
অভাগিনী বেহুলার কথা কর অবধান।।
পূর্বকালের কথা ধর কহিয়াছে বুড়াবুড়ি।
সর্পাঘাতে মৈলে লোকে অগিতে না পুড়ি।।
কলার মাজুষে করি ভাসাও গাঙ্গড়ি।
আমি অভাগিনী যাব প্রভুর সংহতি।।[২৭]

সুনির্দিষ্ট কারণেই একটু দীর্ঘ অংশ আমরা উদ্ধার করেছি। আমাদের বিচারে সম্ভবত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের সবথেকে তাৎপর্যময় অংশ এটি। আমরা জানি মনসামঙ্গলের সব থেকে জনপ্রিয় অংশ তার জাগর পালা, অর্থাৎ চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনি। তার মধ্যে মনসামঙ্গলের কবিদের সবথেকে বেশি উদ্দেশ্য সিদ্ধকারী (মনসার মহিমা, ভক্তির মহিমা, সতীত্বের মহিমা, সতীত্বের সাধনায় যেকোনো বাধা অতিক্রম করে যাওয়ার পরাকাষ্ঠা ইত্যাদি ইত্যাদি) অংশ মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে গাঙুরের জলে কলার মান্দাসে বেহুলার ভেসে স্বর্গপুরে পৌঁছানো ও স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা। অর্থাৎ মহিমান্বিত সতী বেহুলার মরণের ওপার থেকে স্বামীকে জীবিত করে আনার মতো অসাধ্য সাধনের কাহিনি যা তাকে এদেশের সাবিত্রীর বা বিদেশের অরফিউসের সমগোত্রীয় করে তোলে।

কিন্তু কী ছিল বেহুলার সেই অভিযানের প্রেষণা! প্রেম একেবারেই নয়। প্রেম গড়ে ওঠার সময়ও অপর্যাপ্ত এবং একটি মঙ্গলকাব্যেও তেমন ইঙ্গিতবাহী পঙক্তি নেই। সর্বত্র আছে লোকলজ্জার থেকে রক্ষা পাওয়ার অনুসারী চিন্তা। স্বামীঘাতিনী অপযশ থেকে রক্ষার নিমিত্তে বেহুলার ভাসান যাত্রার কথাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে আছে। এখানেও আছে। কিন্তু তার সঙ্গে এমন একটি শব্দ বিজয় গুপ্ত প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন যা, আমাদের ভাবিয়ে তোলে। শব্দটি হল 'ভয়'। শব্দটি কোন সময় কবি উচ্চারণ করছেন! যেসময়ে চাঁদের মুখে বেহুলার লখিন্দরের সঙ্গে চিতার আগুনে সহমৃতা হওয়ার সম্ভাবনা বা প্রস্তাব, যাই বলি না কেন, সমাগত হয়ে আসছে। সতীদাহের সমকালে এক নারীর আগুনে পুড়ে মরতে 'ভয়'। বেহুলা বুদ্ধিমতী। স্বামীর শরীর দাহ হলে তার সহমরণ অনিবার্য। কারন সে এমন এক সমাজে বাস করছে যেখানে তরতাজা যুবক

মারা গেলে সমাজ যত না কাঁদে, তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'জ্ঞাতিগনে হাসিবে ঘরে বাসি মড়া'। ফলে এই নিষ্ঠুর সমাজের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার থেকে অনেক যুক্তিযুক্ত বিকল্প পথের সন্ধান করা। বেহুলা সেটাই করেছে যুক্তির উপর যুক্তি সাজিয়ে। অর্থাৎ বেহুলার ভাসান যাত্রা আসলে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সমাজের কাছে অরণ্যে রোদন না করে এক বুদ্ধিমতী নারীর আপন প্রাণ রক্ষার বিকল্প পথের সন্ধান। সে অভিযান কোনো প্রতিজ্ঞার অভিব্যক্তি নয়, মানুষের যে মৌলিক অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার, সেই অধিকারের নিমিত্তে উদ্ভুত পরিস্থিতি অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত। সতীত্ব, সিঁদুরের মাহাত্ম্য, পত্নীর পুণ্যে পতির জীবনলাভ প্রভৃতি প্রচলিত অর্থবোধের থেকে অনেক দূরবর্তী এক বাস্তব সমাজবীক্ষার মধ্যে আমাদের নিয়ে আসে ওই 'ভয়' শব্দটির প্রয়োগ। বিনির্মিত পাঠ এভাবেই ভেঙে চলে প্রচলিত অর্থের সংসার। সৃষ্টি করে নব নব অর্থের সম্ভাবনা। পরমুহূর্তেই তা আবার প্রশ্নাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

মনসামঙ্গলের বিনির্মিত পাঠ : প্রসঙ্গ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের বহুশ্রুত মঙ্গলকবিদের মধ্যে অন্যতম। বিজয় গুপ্তের মতো অত বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর কাব্যের যে পরিমানে অনুলিপি হয়েছে এবং ভাষা যে মাত্রায় আধুনিক, তাতে আমাদের এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই যে কবির মনসা-গান যথেষ্ঠ প্রচারিত ছিল ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেন সমগ্র মঙ্গলকাব্য সম্পর্কেই পুচ্ছানুসারিতার অভিযোগ এনেছিলেন। মনসামঙ্গল কাব্যের সম্পর্কেও কথাটি আমাদের প্রযোজ্য মনে হয়েছে। দেবখণ্ড থেকে মানব বা বণিকখণ্ড, সে একই কাহিনির অনুসরণ। সেই একই ভাবে শিবের কামদগ্ধ হওয়া, পদ্মপাতে রেতস্থাপন, পাতালে মনসার জন্ম, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিরোধ, লখিন্দরের মন্দ ভাগ্য, বেহুলায় ভাসান যাত্রা, লখিন্দরের প্রাণ সঞ্চার ও চাঁদ সদাগরের মনসা পুজো। এর মধ্যে খুব একটা নতুনত্ব নেই। আমাদের মঙ্গলগানের কবিদের কাব্যে প্রযুক্ত শব্দের মধ্যেই নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে ভিন্ন বা অনুক্ত অর্থের সংসারে অনুপ্রবেশ করতে হয়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ক্ষেত্রেও আমাদের সে প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। সন্দেহ নেই জনপ্রিয়তায় বিজয় গুপ্তের সমকক্ষ না হলেও কবিত্বগুণে কেতকাদাস বিজয় গুপ্তের থেকে কিছুটা অন্তত উত্তম স্তরের ছিলেন। একই সঙ্গে একথাও আমরা বলতে পারি মনসামঙ্গলের কোনো কবিই প্রথম শ্রেণির কবি ছিলেন না, যদি মুকুন্দ চক্রবর্তী বা ভারতচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণির কবি হিসেবে আমরা ধরি। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দকে মোটামুটি রাঢ় বঙ্গের কবি ধরা চলে। তিনি কাব্যে শাসক

বরা খাঁ-র উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে এই বরা খাঁ ছিলেন সেলিনাবাদ পরগনার প্রশাসক ছিলেন। এই সেলিমাবাদ পূর্ববঙ্গের পাট উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ সেলিমাবাদ নয়। এই সেলিমাবাদ রাঢ়ের সেলিমাবাদ, যার উল্লেখ আমরা মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে পেয়েছি। যদিও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় অত্যাচারে (বরা খাঁ'র মৃত্যু হলে ও শাসক বদল হলে) তাঁদের সপরিবার সেলিমাবাদ ত্যাগ করতে হয়। পাঠ পর্যালোচনার জন্য আমরা অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত (প্রথম পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা) 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল' গ্রন্থটি অবলম্বন করেছি (প্রথম সংস্করণ, নাগপঞ্চমী, ১৩৮৪)।

কবির একটা সুচারু কল্পনাশক্তি ছিল। সঙ্গে ছিল ভাষার উপর দখল। রাঢ়ী, যাবন মিশাল ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাতেও নিজের অধিকার দেখিয়ে আমাদের মধ্যে অন্তত এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন যে, কবি পণ্ডিত ছিলেন। একই সঙ্গে তাঁর কাব্যের কিছু শব্দ পর্যালোচনা করে আমরা বুঝেছি কবি বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। এখানে তেমন কিছু লক্ষণাক্রান্ত শব্দযুক্ত পঙক্তি উদ্ধার করতে চাই :

১. লখিন্দরের বিবাহসজ্জায় কবি উল্লেখ করলেন :

হরিদ্রা মাখিয়া হৈল কাঞ্চনের জুতি।
পরিধান করিল হরিদ্রাযুত ধুতি।।[২৮]

এই 'হরিদ্রাযুত ধুতি' বা পিতবাস কৃষ্ণের সজ্জাকে স্মরণ করায়। অন্য কোনো মনসামঙ্গলেই লখিন্দরের পিতবাস চোখে পড়েনি।

২. বিবাহকালে বেহুলার প্রসাধনী উল্লেখ করতে গিয়ে কবি লিখলেন :

হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়।
নারায়ণ তৈল দিল তাহার মাথায়।।[২৯]

দ্রষ্টব্য 'নারায়ণ তৈল' কথাটি। নারায়ণ কোনো তৈল উপাদান নিশ্চয়ই নয়। সম্ভবত সুলক্ষণী নারায়ণ নিবেদিত বা স্পর্শিত তেল। এখানে কবির বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন ভাবে ধরা দেয়।

এছাড়া কালনাগিনী, শ্বেতকাক, নেত্রবতী বা নেতা সহ অনেকের মধ্যে এমন হৃদয়বৃত্তির পরিচয়বাহী শব্দ প্রয়োগ করেছেন যে, তাতে করে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণবীয় তৃণাদপি সুনিচেন ভাব তো কবি-নাম 'কেতকাদাস'-এও ধরা পরে। যেখানে 'দাস' কবির পদবী নয়, স্বীয় গৃহীত উপাধি। ঠিক যেমন বৈষ্ণব মহাজনরা নিতেন।

বেহুলার ভাসানকালে কবি তিনজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা বেহুলাকে নানা ভাবে ভোগ করতে চেয়েছিল। এরা তিনজন হল গোদা, জাগাতি ও বৈদ্য। প্রথমে আসি গোদার প্রসঙ্গে।

গোদা জাতিতে কুলীন। অর্থাৎ বংশজীবী তথা বংশ ভাঙিয়ে খান। কৌলিন্য ব্যবস্থার সৌজন্যে ইতোমধ্যেই চারজন স্ত্রী তার। পৃথুলতার জন্যই তাকে 'গোদা' বলা চলত। নদী তীরবর্তী একটি ঘাটে তার সঙ্গে দেখা ও পানিপ্রার্থনা। 'গোদা' বললেই এক সংযমহীন মেদাধিক্যের কিম্ভূত মানুষের কথা আমাদের মনে চলে আসে। এতে হাস্যরস সৃষ্টি হয় অম্লান বদনে। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য সম্ভবত শুধু হাস্যরস সৃজন ছিল না। সেজন্যই কবি গোদার চারটি বধূ, আপাদমস্তক দারিদ্র্যের চিহ্ন সহ একটি শ্রুত্যানুপ্রাস স্বরূপ 'গোদ' যুক্ত করলেন। তাতে যুক্ত করলেন দুর্গন্ধ ও ঘা-রস শোষণকারী মক্ষিকা :

পরিধান ছিঁড়া টেনা ঘরে নাহি সম্ভাবনা
গোদে তোর ঘন উড়ে মাছি।
দারুণ গোদের ঘ্রাণ স্থির নহে তার প্রাণ
যে ধনী তোমার ঘরে আছি।।[৩০]

'গোদ' ক্রান্তীয় অঞ্চলের মশাবাহিত এক প্রকার পরজীবী ঘটিত রোগ, যার আর এক নাম ফাইলেরিয়াসিস। এই পরজীবীসমূহ মানুষের লসিকাতন্ত্রে বাসা বেঁধে এলিফেন্টায়াসিস নামক উপসর্গ তৈরি করে। তার ফলস্বরূপ চামড়া ও তার নিচের টিসু মোটা হয়ে যায়। আর তা হয় মূলত শরীরের নিম্নাংশে। কিন্তু কোনো ঘা বা পচনজনিত দুর্গন্ধযুক্ত আত্মপ্রকাশ এই রোগে হয় না। কবির সম্ভবত এই রোগ সম্পর্কে কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। হতে পারে কবি কেবল জানতেন 'গোদ'-এ মানুষ ফুলে যায়। বাকি শব্দগুলি তিনি সৃজন করেছেন পরজীবী কুলীনদের প্রতি কবির অপ্রকাশিত অদম্য আক্রোশ থেকে। তাছাড়া মধ্যযুগের ইতিহাস ও সাহিত্যের নিষ্ঠ পাঠক মাত্রেই সুবিদিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব মতানুসারীদের অভ্যন্তরীণ কলহ সম্পর্কে। সেটাও কবিকে দিয়ে এই সমস্ত অবাস্তব কথা লিখিয়ে নিতে পারে।

জাগাতি কর্মজীবী। তার প্রতি স্বভাবতই কবির ক্রোধ নেই। সেও বেহুলাকে চেয়েছে। কিন্তু সে চাওয়ায় উগ্রতা নেই। কবিও দ্রুত তার 'সুমতি'-র প্রবন্দন করেছেন। 'দান' পর্যন্ত নেয়নি সে। পরিবর্তে পেয়েছে 'কল্যান' কামনা। কিন্তু 'বদ্যপুর ঘাটে'-র বৈদ্যের আবদারটি তেমন নিষ্পাপ মোলায়েম ছিল না। বেহুলাকে সটান সে জানায় :

মৃত জীয়াইব যদি এক সত্য রাখ।
তিনদিন তিনরাত্রি মোর সঙ্গে থাক।।[৩১]

বৈদ্য তো বুদ্ধিজীবী। কিন্তু অসহায় নারীর প্রতি তার এই লুব্ধক মানসিকতা কবির সমাজবাস্তবতা জ্ঞানের পরিধি আমাদের কাছে উন্মোচিত করে। পরিবারের বাইরে নারী যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কত অসহায়, কত নিগৃহীত, বংশজীবী-কর্মজীবী-বুদ্ধিজীবীদের এক সারণিতে দাঁড় করিয়ে কবি সেটাই যেন দেখিয়ে দিলেন। এই সমাজের সমাজপতিরা কাঁচা বয়সী বিধবা নারীদের জন্য কোনো উত্তম পুনর্বাসন কল্পনা করতে পারেননি বলেই সম্ভবত সহমরণের মতো একটা আপদ-বিদায় গোচের সমাধান ভেবেছিলেন। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে বেহুলার উদ্দেশ্যে তেমনই নিদান দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে বিনির্মিত পাঠের সম্ভাবনাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

মনসামঙ্গলের বিনির্মিত পাঠ : প্রসঙ্গ জগজ্জীবন ঘোষাল

এতক্ষণ আমরা দক্ষিণবঙ্গের মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবিদের কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের বিনির্মাণ ঘটিয়ে তার অভ্যন্তরস্থ অর্থের বহুরৈখিকতা নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিদের সৃজনে আমরা মনোনিবেশ করেছি। কিন্তু এখন আমরা উত্তরবঙ্গের কবিদের রচনাতেও মনোবিবেশ করতে চাই। সেখানে উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে প্রথমেই আমাদের আলোচনায় আসেন কবি জগজ্জীবন ঘোষাল। কবির উল্লেখ থেকে তাঁর পৈতৃক ভিটে সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কিছু বলা না গেলেও তাঁর ইঙ্গিত থেকে মনে হয় তিনি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের রাজত্বকালে কাব্য রচনা করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে তাঁর এই কাব্য রচিত হয়েছিল।

জগজ্জীবনের রচনার দিকে মনোনিবেশ করলে দক্ষিণবঙ্গের কবিদের থেকে কিছু বিষয়ে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন তিনি উত্তরবঙ্গীয় ধর্মমঙ্গলের ঢঙে কাব্যের প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্বের অনুষঙ্গ রেখেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের সেই সূচনায় ধর্ম তথা নিরঞ্জনকেই আদি দেবতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ধর্মমঙ্গলের মতো। ধর্মমঙ্গলের জনপ্রিয়তা ও সৃজন সবথেকে বেশি উত্তরবঙ্গে। উত্তরের প্রাকৃতিক বন্ধুরতা মানবজীবনে যে কষ্টসহিষ্ণুতা আবশ্যিক করে তোলে, তাইই কাব্যে দক্ষিণের আর্দ্ররসের বিপরীত রৌদ্ররসের ও উদ্ভটরসের জারক। ধর্মমঙ্গল সেই রৌদ্ররসের কাব্য। সেই একই কাঠামোতে মূর্তিলাভ করেছে জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলও। উদ্ভট গ্রাম্যতাও কবির রচনায় লক্ষণীয়। জগজ্জীবনের কাব্যের কোনো কোনো গবেষক জগজ্জীবনের কাব্যে

প্রবল গ্রাম্যতা দোষের অভিযোগ (যেমন সুকুমার সেন করেছেন, দ্র. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড) খণ্ডণ করতে গিয়ে (যেমন, প্রামাণিক, বর্ণালী, ২০১২, 'লোক ঐতিহ্যের দর্পণে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৩) যতই বলুন না কেন, এ কবির জীবনমুখিতা, তবু সে দোষ খণ্ডিত হয় না। এপ্রসঙ্গে একটি দ্বিপদী আমরা উদ্ধারের বাসনা রাখি :

কহ কথা তিন পুত্র মোর কাছে।
উপার্জ্জিয়া খাল্যে ফল দোষ কিবা আছে।।[৩২]

এখানে প্রশ্নকর্তা ধর্ম। উদ্দিষ্ট উত্তরদাতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। 'উপার্জ্জিয়া' শব্দটি এখানে যৌনতা বা গর্ভসঞ্চার অর্থে ব্যবহার করেছেন কথক। 'ফল' শব্দটি এখানে আপন কন্যা 'মনসা'-কে প্রচ্ছন্ন রেখে উচ্চারণ করেছেন। অর্থাৎ নিজে যে ফল সৃষ্টি করেছি, তাকে নিজেই ভোগ করলে আসুবিধা আছে কিনা। সমাজবাস্তবতার খাতিরে কী আমাদের মেনে নিতে হবে মধ্যযুগে পিতা আপন কন্যাকে ভোগের এমন যুক্তিজাল বিস্তার করতেন বা দুরাত্মাসুলভ এমন ছল করতেন! এটা নিশ্চিত গ্রাম্যতা। এখানেই শেষ না। নিজের কন্যাকে ভোগ শেষে দুরাত্মা ধর্ম প্রীত হয়ে মহেশ্বরকে বর দিচ্ছেন :

এক কথা কহি না করিহ উপহাস।
মুখ মেলে সত্বরে উদরে দেহ বাস।।...
তুমি আমি অর্দ্ধ অঙ্গ হইব শূলপানি।
মনসা-কামিনী হবে তোমার ঘরণী।।[৩৩]

অর্থাৎ নিজে ভোগ করেই ক্ষান্ত হলেন না ধর্ম। পুত্রের আগামীতে ভোগের ব্যবস্থা করে রাখলেন। পুত্র ভোগ করবে আপন ভগিনিকে! সেই কন্যা কেবল 'কামিনী' (কাম চরিতার্থের উপায়!)! এটা কী সমাজবাস্তবতা হতে পারে! এ নিখাদ গ্রাম্যতা। শব্দের দিকে অভিমুখ থাকলেই যুক্তিহীন আবেগের মোহজাল ছিন্ন করে সত্যে উপনীত হওয়া যায়। মুখরোচক কাব্যের যোগান দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে কবি একেবারে সংযমের মাথায় ঝাঁটা মেরে বসেছেন। মনসা, গৌরী, সরস্বতী, চণ্ডী একাকার করেছেন। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যতদূর সম্ভব প্রত্যেক পুরুষ দেবতার রতিচিত্র এঁকে গেছেন নির্বিচারে:

দুর্গার মোহিনী রূপ অতি বিচক্ষণ।
দেখিয়া ব্রহ্মার মনে হানিল মদন।।
ব্রহ্মার স্খলিত কাম শরীর পাতল।
জলের উপরে ভাসেন টলমল।।[৩৪]

সনাতন পুরাণের ঢঙে নিজের মনসামঙ্গলকে ঢালতে চেয়ে হিমালয়কে বানিয়েছেন হেমন্ত ঋষি, তার স্ত্রী মেনকা, মনসা ও পার্বতী জগজ্জীবনের কাব্যে একাকার হয়েছেন। কবি কেন মনসাকে পুনর্জন্ম দিয়ে হেমন্তের ঘরে পার্বতী করলেন আর কেনই বা শিবের রেতঃস্খলনে আবার মনসার জন্ম দিলেন তা আমাদের ভাবায়। কবি লিখেছিলেন :

বুঝিয়া কহিল মোকে ধর্ম্ম মহামুনি।
মনসা সুন্দরী হৈবেক তোমার ঘরণী।।
পুড়িয়া না গেল পোড়া মনসা-কামিনী।
অনলের মাঝে দেবী হইল কন্যাখানি।।...
হেমন্তের ঘরে দেবী বাঢ়ে দিনে দিনে।
পার্ব্বতীর সঙ্গে দেখা হইবে কেমনে।।[৩৫]

অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল এই, নিরঞ্জন প্রথমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সঙ্গে মনসাকে সৃষ্টি করলেন। সেই মনসাকে জোর করে বিবাহ করলেন। কিন্তু বিবাহান্তে তাঁর মৃত্যু হলে সতী ধর্ম অনুসারে সহমৃতা হয়ে পুনর্বার চিতাগ্নিতেই জন্ম নিলেন। হেমন্ত-মেনকা গৃহে গৌরী রূপে (বা 'পার্ব্বতী' রূপে) বেড়ে উঠলেন। শিবের সঙ্গে বিবাহ হল নিরঞ্জনের বর অনুসারে। মনে রাখতে হবে মনসা কিন্তু চিতার আগুনে মরেননি, 'পুড়িয়া না গেল পোড়া' কেবল আকার বদলেছেন 'অনলের মাঝে দেবী হইল কন্যাখানি'। অর্থাৎ একটাই জন্মে তিনি নিরঞ্জন ও শিবের পত্নী হয়েছেন। সনাতন বৈধব্যের অনুপান কোথায় গেল পাঠকের পক্ষে বোঝা দায়। এর পর আবার মনসার জন্ম হচ্ছে শিবের ঔরসে পদ্মপাতে। তার পর শিবের সঙ্গে কৈলাশে এসে দুর্গার সঙ্গে সতিন কলহে লিপ্ত হচ্ছেন। আহত হচ্ছেন, দংশনও করছেন। যুক্তি পরম্পরার দিক থেকে দেখলে সমস্তটা আলেয়া মনে হতে বাধ্য। আসলে কবি মনসাকে দেবাদিদেবী হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে নিরঞ্জনমঙ্গলের ঢঙে প্রথমে সাজিয়েছেন এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সমসাময়িক করেছেন। কিন্তু প্রচলিত মনসাকথার কাঠামোর বাইরেও যেতে পারছিলেন না। সেখানে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন আছে। ফলে শিব-কন্যা পদ্মা হিসেবে মনসাকে দেখাতেই হত। এই প্রজন্ম প্রভেদ ঘটাতে গিয়ে কবি নাস্তানাবুদ হয়ে এই রকম অযৌক্তিক ভাবে মনসা-দুর্গা একাকার করে রেখেছেন। সঙ্গে যোগ করেছেন সহায়ক সতীন হিসেবে গঙ্গাকে। যুক্তিবাদী মনের কাছে একাব্যের মধ্যে কবির সতর্ক অভিনিবেশের অভাব চোখে পড়তে বাধ্য।

মনসামঙ্গলের বিনির্মিত পাঠ : প্রসঙ্গ জানকীনাথ

পণ্ডিত জানকীনাথ পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি। তাঁর সুনির্দিষ্ট পদবি আমরা উল্লেখ করতে পারি না। সব মিলিয়ে সাড়ে দশখানা পুথি আবিষ্কার হয়েছে জানকীনাথের ভণিতা সম্বলিত। অধিকাংশই খণ্ডিত। অনেক প্রক্ষিপ্ত পাঠও আছে জানকীনাথের নামে। সেগুলি লিপিকরদের সংযোজন। আমরা পাঠের জন্য ড. হরেকৃষ্ণ আচার্য সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ' গ্রন্থটি অবলম্বন করেছি। এটিই জানকীনাথের কাব্যের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা। পূর্ববঙ্গের কবি হলেও জানকীনাথ একেবারেই জনপ্রিয় ছিলেন না। আশুতোষ ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা' সংকলনটি প্রকাশ করেছেন তাতে সর্বমোট নয়জন কবির মনসাগান রয়েছে। সেখানেও জানকীনাথের উল্লেখ নেই। খুব গুরুত্বপূর্ণ কবিত্বও জানকীনাথের মধ্যে আমরা দেখিনি। তবু এমন কিছু কিছু বাক্য ও পদের নিদর্শন আমরা জানকীনাথের সৃজনে পাই, যা সমকালীন সমাজের সম্পর্কে আমাদের অশ্রুতপূর্ব অনুভব নিয়ে আসে। নিচে আমরা তেমনই কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধার করছি :

১. শিব যখন ডোমনী ভেকধারী চণ্ডীর কাছে রতিপ্রার্থনা করে ধরা পড়ে খুব স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করছেন :

পুরুষের কিবা দুষ হহিল ইহাতে।
ভার্গ্য সে ইহাতে আমি না ঘটীয়ে তর্ত্তে।।[৩৬]

এখানে 'ভার্গ্য' কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ এবং স্ত্রী কেউই পুরুষ বা স্ত্রী হয়ে জন্মায় না, জন্মে পুরুষ বা স্ত্রী নামে পরিচিত হয় কেবল কিছু প্রত্যঙ্গের উপর ভিত্তি করে। শিব বলতে চাইছেন এ'সবই ভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্যের সহায়তা লাভ করে একবার পুরুষ হয়ে জন্মাতে পারলে যেকোনো বহুগামিতা বা সামাজিক অন্যায় করা চলে। তাতে কিছুমাত্র 'দুষ' হয় না। পুরুষ সমস্ত 'দুষ'-এর ঊর্ধে। এর মাধ্যমে যেমন একটা সামাজিক চিত্র মেলে, তেমনি সন্তর্পনে কী কবি একটা সাধনমার্গীয় কথাও বলে গেলেন না! যেখানে সাধক পুরুষার্থ সমস্ত মলিনতার উপরে অবস্থান করে। এই বহুরৈখিকতা নির্মাণই তো বিনির্মাণের কথা। সেই পাঠে কাহিনি ছাড়িয়ে পাঠক পৌঁছবেন সমাজবাস্তবতায় বা সাধনবার্তার গভীরতর কোনো তলে।

২. শিব ও মনসার প্রথম সাক্ষাৎকালে কবির পঙক্তিতে উঠে আসছে এমন কিছু কথা যা আমাদের নজরে আটকে যায়। সব মনসামঙ্গলেই একথা আমরা সমতা বজায়

রেখে শুনেছি পাতালে বৃদ্ধিপ্রাপ্তা শিবতনয়া মনসাকে যৌবনে প্রথমবারের জন্য দেখে শিবের কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল। অচেনা নারীকে তিনি ভোগ করতে চেয়েছিলেন। কোথাও কোথাও বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে তার নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু কন্যা তাঁর পরিচয় বিবৃত করার পর শিব নিজেকে নিবৃত করেছেন। কোথাও কোথাও মিলিত হয়েছেন [যেমন কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে, দ্র. ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, ড. আশুতোষ দাস (সম্পা:), ১৯৬০, কবি জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত মনসামঙ্গল, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়], তবে বিবাহ করে। কিন্তু জানকীনাথের কাব্যে শিব এক অন্য অভিজ্ঞতা রাখলেন আমাদের জন্যে। আপন কন্যার পরিচয় জানার পরেও :

মদনে মহিত শিব প্রবদ না মানে।
বল করিবারে চাএ হৈয়া ভ্রমর্জ্জানে।।
শিবের চরিত্র দেখি মনুসা কুমারী।
মহাকুপে জ্বলিল অত্যন্ত ক্রধ করি।।[৩৭]

এই 'বল' শব্দটি যে ধর্ষণের সামাজিক অস্তিত্বকে স্মরণ করায়, সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি। প্রশ্ন হল শিব কেন 'মনুসা'-র পরিচয় জানার পরেও 'বল করিবারে চাএ'! আসলে যে সম্পর্কের সামাজিক নিরাপত্তা নেই, সেই সম্পর্কের মধ্যে নারী প্রধানত অসহায়। মনসা শিবের ঔরসে জন্মগ্রহন করলেও যাকে বলি সামাজিক স্বীকৃতি বা সোস্যাল রেকগ্‌নিশন, তা তার অর্জন করা হয়ে ওঠেনি। শিব একথা জানেন বলেই মনসা তাঁর কাছে 'তাঁর মেয়ে' না হয়ে শুধু 'মেয়ে' বা 'কামিনী' হয়ে রয়ে গেছে, যাকে ভোগ করাই যায় পিতৃতান্ত্রিক ভোগ-বিধানে। এমন সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কলার মঞ্জুষায় বারবার ভুক্ত হওয়ার মতো অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন বেহুলাও। ইহুদি ধর্মগ্রন্থ ফিজেসে ধর্ষণোদ্যত আদমকে রুখতে লিলীথকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়েছিল (দ্র. ফিজেস, ১৯৭০, পৃ. ২৭)। নিজের সম্মান রক্ষায় নারীর প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঘটনা মানব ইতিহাসের পাতায় সেই প্রথম। জানকীনাথের পদ্মা সেই লিলীথের অনুগামিনী হলেন :

পরিণাম না চাহিল কুপের কারন।
বাপরে চাইল পৌদ্যা বিষ নয়ন।।
বিষের্ছর্ন্ন হৈয়া তবে দেব ত্রিলুচন।
মহ পাইয়া ভুমিতে পড়িলা ততক্ষন।।[৩৮]

মধ্যযুগের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের জেদ, বল, ইচ্ছা, অহং – এইসবের কাছে নারীকে (এমনকি দেবী হলেও) শরণাগতি নিতে দেখেছি। কেতকাদাসের মঙ্গলকাব্যের শেষ মাথা পর্যন্ত চাঁদের 'হেঁতালের বাড়ি'-র প্রতি মনসার যে ভয় দেখেছি, তা চাঁদের জয়ের উপরেই শিলমোহর লাগায়। কিন্তু জানকীনাথের মনসা একেবারে আলাদা। সে জন্মলড়াকু। এবং আত্মসম্মানী। মনসাচরিত্র নির্মাণের দিক থেকেই জানকীনাথের 'পদ্মাপুরাণ' অনন্য হয়ে ওঠে। বিনির্মিত পাঠের উদ্দেশ্যে জানকীনাথের কাব্যে দৃষ্টি দিতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, কম প্রচারপ্রাপ্ত এই মনসামঙ্গল কাব্যটির সঠিক মূল্যায়ন আজও বঙ্গবিদ্যা মহলে সেভাবে হয়নি। ভবিষ্যতে কবির কাব্যে আরও বিস্তারিত অনুধ্যানের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গলের পাঠের মধ্যে যে সব অনুক্ত অর্থের এলাকা আছে, সেগুলি নিয়ে। প্রথমেই আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় মনসামঙ্গলের বা অনুরূপ প্রচলিত কাহিনিগুলির একটা রূপরেখা নির্মাণের চেষ্টা করেছি। তার পরে কবি ধরে আলোচনায় আমরা বারবার বিনির্মাণ পাঠরীতির প্রয়োগ করেছি। একই সঙ্গে আমরা পাঠের মধ্যে আমাদের উদ্ধার করা অর্থের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেগুলি কেন প্রকাশিত হয়নি, তার যুক্তিসঙ্গত আলোচনার চেষ্টা করেছি।

সূত্র ও টীকা

১. Google Wikipedia, Viewed on Friday, 31.03.2017, 2.54 am (IST)

২. Sartre, Jean-Paul, 1965, Situations, (English Ed.), New York, George Braziller, ISBN 0807602922 (ISBN 13: 978-0-807-60292-8), P.29-156

৩. Camus, Albert, March 1991, The Plague, UK, Vintage International Series, Penguin, ISBN 0679720219 (ISBN 13: 978-0-679-72021-8)

৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, সেপ্টেম্বর ২০১৩, জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.২১

৫. Levi-Strauss, Claude, 1963, Author's Preface to the French Edition, Structural Anthropology, UK, Hachette, British Library Catalog Card Number: 801-95-PN-63-17344, ISBN-13:978-0-465-09516-2

৬. Foucault, Michel, 28 November 1988, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, New York, Abridged (Paperback Edition), ISBN 13: 978-0-679-72110-9

৭. Hobsbawm, Eric, 8April 2010, Palmiro Togliatti: A Biography by Aldo Agosti translated by Vanna Derosas and Jane Ennis and IL sarto di Ulm: Una possibili storia del PCI by Lucio Margi, London Review of Books, Vol.32, No.8, ISSN 0260-9592

৮. Foucault, Michel, 29 March 1994, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, UK, Vintage Book Series, Penguin, P.13-57, 388-416

৯. Barthes, Roland, 2007, Critique Et Verite, UK, The Athlone Press, British Library data: 1.criticism 2.linguistics 3.french literature-history and criticism, Catalogue No. 801-95-PN-98.I.V, ISBN 13: 978-0-826-49474-0

১০. Barthes, Roland, 1975, S/Z, New York, Hill & Wang, (Paperback Edition), ISBN 13: 978-0-374-52167-7, P.7-15, 221-288

১১. Derrida, Jacques, 1982, Margins of Philosophy, Chicago, University of Chicago Press, Reprint, ISBN 02261-43260, ISBN 13: 978-0-226-14326-2.

১২. Derrida, Jacques, 1st January 1990, Glas (Paperback), America West, University of Nebraska Press, ISBN 13: 978-0-803-26581-3, P.52-262.

১৩. Reality Principles: An Interview with John R. Searle,
REASON, Webpage viewed on 24April, 2018, 11.35pm (IST), source link:

১৪. Derrida, Jacques, 2002, Of Grammatology, 'Translator's Preface', Gayatri Chakravorty Spivak (Translated), Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, p. xiii

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ২০০৩, বাংলা চার অক্ষর, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৫৮-৫৯

১৬. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ২৩০-২৩৭

১৭. তদেব, পৃ. ২৪০-২৪১

১৮. তদেব, পৃ. ২৪২-২৪৮

১৯. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা:), ২০১৫, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, কলকাতা, রত্নাবলী, পৃ. ২৫৫

২০. তদেব, পৃ. ২৫৬

২১. তদেব, পৃ. ২৬২

২২. তদেব, পৃ. ২৬৩

২৩. তদেব, পৃ. ২৬৪-৬৫

২৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা:), ২০০৯, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, পৃ. ৮৪

২৫. তদেব, পৃ. ৮৪

২৬. তদেব, পৃ. ৮৫

২৭. তদেব, পৃ. ২৯২

২৮. কয়াল, অক্ষয়কুমার, চিত্রা দেব (সম্পা:), নাগপঞ্চমী, ১৩৮৪, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, কলকাতা, লেখাপড়া, পৃ. ২৪৮

২৯. তদেব, পৃ. ২৫০

৩০. তদেব, পৃ. ২৬৬

৩১. তদেব, পৃ. ২৭১

৩২. ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, ড. আশুতোষ দাস (সম্পা:), ১৯৬০, কবি জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত মনসামঙ্গল, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৩

৩৩. তদেব, পৃ. ১২-১৩

৩৪. তদেব, পৃ. ৮৯

৩৫. তদেব, ১৯-২০

৩৬. আচার্য, ড. হরেকৃষ্ণ (সম্পা:), ২০০৮, লোকপূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ, আগরতলা, ত্রিপুরা, অক্ষর পাবলিকেশনস, পৃ. ২৫০

৩৭. তদেব, পৃ. ২৫৬

৩৮. তদেব, পৃ. ২৫৬-২৫৭